মুহম্মদ আবু তালিব

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা ঃ সাধুতা বনাম অসাধুতা

মুহম্মদ আবু তালিব

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী-র পক্ষে
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,
ঢাকা

হিজরী চৌদ্দশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা : সাধুতা বনাম অসাধুতা :
মুহম্মদ আবু তালিব

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৭৯
মহররম ১৪০০
অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

ই. ফা. প্রকাশনা : ১১০

প্রকাশনায় :
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী-র পক্ষে
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা-২

প্রাচ্ছদ : মাহবুবর রহমান

মুদ্রণে :
মনিরুজ্জমান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

মূল্য : ১০'০০ টাকা

ADHUNIK BANGLA SHAHITYER BHASHA : SADHUTA BONAM AUSADHUTA. 'Language of the Modern Bengali Litareture : Written vs spoken, written By Muhammad Abu Talib and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca, for the Islamic Cultural Centre, Rajshahi to celbrate the commencement of 1400 Al-Hijra.

Price : Tk. 10·00

লেখকের কৈফিয়ত

"যে বাংলা আমার মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়," সেই বাংলার খোঁজে আমার এ অভিযাত্রা।

জানিনে, আমার এ অভিযাত্রায় সফলতা বা বিফলতার মাত্রা কতখানি; তবে এটুকু জানি, জীবনের কোন প্রয়াসই সম্পূর্ণ সফল বা বিফল নয়। আর বিশ্ব স্রষ্টার কোনো সৃষ্টিই বাতিল বা নিরর্থক নয়।

কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তীকাল থেকেই, ধরা যেতে পারে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেডের রোমান হরফে প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশের পর থেকেই, বাংলা ভাষার আধুনিক রূপ নির্ধারণের নানা প্রয়াস চলে। তারই ফলশ্রুতি আধুনিক বাংলা ভাষার সাধুতা বনাম অসাধুতার লড়াই। এর উদ্যোক্তারা প্রধানত যেহেতু বিদেশী এবং বিজাতীয়, তাঁদের প্রয়াসেও সেই বৈদেশিক ও বিজাতীয় প্রবণতা অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ দেশীয় পণ্ডিত সমাজও, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রাথমিকভাবে তাঁদেরই আনুকূল্য করেছিলেন। বাংলা গদ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক সজনীকান্ত দাস তো স্পষ্টই একে "আরবী-ফারসী নিসূদন যজ্ঞ" নামে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায়—

> "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে।"

এই যজ্ঞের ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। নিবন্ধকার এই কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতের প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলা ভাষায় সাধুতা বনাম অসাধুতার এই মামলা নিতান্ত অল্প দিনের নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছিল দেখা যায়। হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণে দেখা যায়, তখন ঐ লোককে অধিকতর শুদ্ধভাষী বলা যেত, যাঁর কথায় বেশী পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের আমেজ থাকত। অথচ কৌতূহলের ব্যাপার, হ্যালহেড সাহেবই তাঁর বইয়ে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে ভাষাকে অসাধু ভাষায় রূপান্তরিত করবার জন্য সমকালীন শাসক সম্প্রদায়কে অহেতুক দায়ী করেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফারসী শব্দাবলী বিদেশী (অসাধু) বলে বিতাড়িত হয়েছে এবং তার স্থানে সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্দাবলী (সাধু বলে) গৃহীত হয়েছে। ''কিন্তু এই অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে, একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রাখিয়াছে। কেবল ছাপা কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্র সাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মত পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতেছে।

......আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে।.........

সাধুভাষার কাব্য সভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভর্তি করিয়াছি।' ফলে, 'সংস্কৃত ভাষার জরী-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা-বধূটির চোখের জল, মুখের

হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্মতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরীর আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশী; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।" উক্তিটি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'অসাধু ভাষায় রচিত প্রকৃত সাহিত্য-সম্পদ ভট্টাচার্য পাড়ায় মেলে না' বলেছেন—কোন্ পাড়ায় মেলে, তার উল্লেখ করেননি। তবে মনে হয়, সমকালীন "মুসলমান পাড়া লেনে" অনুসন্ধান করলে তার পরিচয় মিলত। এবং বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আসর থেকে এই বাংলাকে তথাকথিত দোভাষী বা 'মুসলমানী বাংলা' বলে বর্জন করা হয়েছিল। সে যা-ই হোক, বর্তমান নিবন্ধে তার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

নিবন্ধটি বেশ কিছুকাল আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গবেষণা-পত্রিকা সাহিত্যিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল (বসন্ত সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল=১৯৬৭); এবার সংশোধিত ও সংযোজিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হ'ল। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই গ্রন্থ প্রকাশে যে যত্ন ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন, তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। খোদা হাফেজ॥

ইতি—

মুহম্মদ আবু তালিব

প্রকাশকের কথা

লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক মুহম্মদ আবু তালিব রচিত বর্তমান পুস্তক বাংলা ভাষার মূল উৎসের সন্ধানে একটি গবেষণাধর্মী প্রয়াস। এই উৎসের সন্ধানে তিনি বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস যেমন পর্যালোচনা করেছে তেমনি এই ইতিহাস পর্যালোচনায় এর আড়ালে ছাইচাপা পড়া অনেক নির্মম ও তিক্ত সত্যকেও তিনি ডুবুরীর মতো দিনের আলোয় এনে উপস্থিত করেছেন। কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ নয়, বরং সত্যোদ্ধারই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা লেখকের উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেই আমাদের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিচ্ছি।

ইংরেজ মনীষী ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড (১৭৫১—১৮৩০) কৃত
"A GRAMMAR OF THE BENGALI LANGUAGE"-এর
দ্বি-শততম প্রকাশনা—উৎসব উপলক্ষে

ও

তথাকথিত 'মুসলমানী বাংলা'র লেখকগণের স্মরণে

সূচী

উপক্রমণিকা
বাংলা গদ্যের শৈশব ও কৈশোর কালের কথা ২
বাংলা গদ্যের খাত বদল ৪
বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের নিউটন ৬
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্য
ও
একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের কথা ৭
হযরত শাহ্ মখদুম ৮
প্রবোধ চন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ৮
বেতাল পঞ্চবিংশতি—বিদ্যাসাগর ৯
হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ ঃ
আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞ ১২
"শাহ মখদুম জীবনী" ও তার ভাষা-রীতি ১৪
'শাহ মখদুমী' বনাম 'সাগরী-রীতি ১৮
লালন শাহী বাংলা ঃ
"বাঙালীর দিন রাত্রির ভাষা" ২৩
আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষা ঃ
জামাল উদ্দীন ও প্রেমরত্ন কাব্য। ২৯
বাংলা সাহিত্যে শাহ গরীবুল্লাহ ও দোভাষী পুঁথির
উত্তরাধিকার ৩৪
মধুসূদন ও বাংলা ভাষা ৩৫
আধুনিক বাঙালী মুসলমান ও বাংলা ভাষা ৩৬
আধুনিক বাঙালী হিন্দু ও বাংলা ভাষা ৩৯
পরিশিষ্ট ৪২

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা
সাধুতা বনাম অসাধুতা

(আদি পর্ব)

আধুনিক বাঙালী জাতীয়তা তথা বাঙালী সংস্কৃতি ও সভ্যতা মূলতঃ লর্ড মেকলে কথিত ইংরিজিয়ানার উপজাত (Bye Product); তাই লর্ড মেকলের বিখ্যাত উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক—"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

অর্থাৎ আমাদের শাসিত ভারতবাসীদের মধ্য থেকে আমাদের সাধ্যমত এমন একটি শ্রেণীর মানুষ গড়ে তুলতে হবে, যারা হবে আমাদের ও তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এবং যারা শুধু রক্ত ও বর্ণে ভারতবাসী হবে, তবে রুচি-রসে, চলনে-বলনে, নীতিবোধে ও মেধায় হবে তাহা ইংরেজ।

আধুনিক বাঙালী জাতি, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইংরিজিয়ানার ছাপ দিতে মেকলে সাহেবরা ক'লকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ক'রেছিলেন (১৮০০ ঈ), সে কলেজে সিভিলিয়ান সাহেবদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আধুনিক বাংলা গদ্যে বই-পুস্তক রচনা করতে গিয়ে তাঁরাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিলেন। এই গদ্যের যা

চেহারা-ছবি হ'য়েছিল, তা আজ আর কারও অজানা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কালক্রমে তারই উপরে আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, ফোর্ট উইলিয়মে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক জন্ম হয়নি, তার জন্ম দেওয়া হ'য়েছিলো। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক নিরন্ধ্র কক্ষে সাহেব ও পন্ডিতে মিলে এই গদ্যের জন্ম দিয়েছিলেন। তার প্রাথমিক পরিচর্যার ভারও নিয়েছিলেন তাঁরাই। ফলে মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতা বাংলা গদ্য এক অস্বাভাবিক, অনাত্মীয় ও যান্ত্রিক পরিবেশে লালিত-পালিত হওয়ায় তার স্বাভাবিক চাল-চলনও বারংবার ব্যাহত হ'য়েছে।

বাংলা গদ্যের শৈশব ও কৈশোর কালের কথা ঃ

বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ বড় চমৎকার ভাষায় বাংলা গদ্যের এই শৈশব ও কৈশোর কালের পরিচয় দিয়েছেন।—"বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধর হইলেন সংস্কৃত পন্ডিত, বাংলা ভাষার সংগে যাঁদের সম্পর্ক হইল ভাশুর ও ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটি পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই।"[১] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য ক'রেছেন।[২] সে যাই হোক — এই 'বিধি'-সর্বস্ব 'গতি'হীনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চিরদিনই এরূপ ছিলো না। আশ্চর্যের ব্যাপারএই যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশী রামরাম বসু তাঁর প্রভু উইলিয়ম কেরী সাহেবের নির্দেশে পয়লা যে গদ্য গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন, সেই 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' ভাষাই ছিল যথার্থ 'গতি'-বিশিষ্ট

১। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—শব্দতত্ত্ব, পৃঃ ।/০ (নাজিরুল ইসলামের বা-সা-নু-ই, উদ্ধৃত)

২। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্গ দর্শন, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪ (পুন-র্মুদ্রিত স ; ১৩৪৬)।

প্রাচীন ঐতিহ্যশালী চলিত বাংলার আদলে রচিত। সমকালীন (১৭৭৮) হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণে ওই ভাষারই প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হ'য়েছিলো যে, সেকালে ঐ লোককেই শুদ্ধভাষী এবং খানদানী ভদ্রলোক বলা হ'ত যার ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ থাকতো।[৩] অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রাদিতে বাংলা গদ্যের যে স্বাভাবিক নমুনা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হ'য়েছে, ফোর্ট উইলিয়মে নির্মিত গদ্য তার সংগেও কোন সম্পর্ক রাখে না। অন্যত্র এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৪]

অবশ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্ণধার উইলিয়ম কেরী (১৭৬২-১৮৩৪ ঈ) সাহেবের মুনশী রামরাম বসু তাঁর পয়লা গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' (১৮০১ ঈ) এই ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে ভাষা তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হ'ল; ফলে, দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপি-মালা'র ভিন্নাদর্শ গৃহীত হ'ল। সত্যি কথা বলতে কি, ভাষাও অপেক্ষাকৃত সরল হ'ল। কিন্তু হ'লে কি হবে, রামরামের রচনার সরলতা তাঁর বিফলতার কারণ হ'য়েই দেখা দিল। পক্ষান্তরে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর পরিত্যক্ত আসনে অভিষিক্ত হ'লেন। মৃত্যুঞ্জয় অচিরেই খ্যাতি সম্পন্ন হ'য়ে উঠলেন। তাঁর এই হঠাৎ খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর 'খাঁটি বাংলা' (purest Bengali), মানে, প্রচলিত আরবী ফারসী বর্জিত ও সংস্কৃতায়িত রচনা রীতি। মৃত্যুঞ্জয়ের এই রীতির সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে ইংরেজ মনীষী মার্শম্যান বলেছেন—
"This book was composed by the late Mrityunjoy Vidyalanker, one of the most profound scholars of the age......for the use

৩। "At present those persons are thought to speak the compound idiom (Bengali) with the most elegance who mix up with the pure Indian verbs, the greatest number of Persian and Arabic nouns." Vide, Dr. Dinesh Chandra Sen's The Bengali Prose. Style, P.6.

৪। মুহম্মদ আবুতালিব। আধুনিক বাংলা গদ্যে মুসলমান। বর্ণালী, ঈদ সংখ্যা, ১৯৬৭।

of young gentleman of the civil studying.........The work which he left unpublished at his death consists chiefly of narratives from the Shastras, written in purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens.......All words of foriegn parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of the compilation."[৫] অর্থাৎ তিনি বাংলা ভাষাকে বিদেশী শব্দভার-মুক্ত খাঁটি (?) বাংলায় রূপান্তরিত ক'রেছেন! অবশ্য মার্শম্যান 'বিদেশোদ্ভূত' (foreign parentage) ব'লতে আরবী-ফারসী শব্দ মনে করেছেন এবং খাঁটি বাংলা বলতে সংস্কৃত ও সংস্কৃতান্বিত শব্দ ভেবেছেন। কিন্তু এই যে খাঁটি বাংলা গদ্যের জন্ম হ'ল, এই গদ্যে "বেদান্ত গ্রন্থ" (১৮১৫) লিখতে গিয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ ঈ) পড়লেন মুশকিলে। এ কি? রামমোহন লক্ষ্য করলেন, এ গদ্যে যে, "অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না; ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না—ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়।"[৬]

বাংলা গদ্যের খাতবদল :

অথচ এমন তো চিরদিন ছিলো না। প্রাচীন বাংলা পদ্যের সরল পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দে সকল শাস্ত্রের বর্ণনা চিরদিনই সম্ভব হ'য়েছে। বাঙালী কবি কঠিন তত্ত্বকথামূলক গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' 'তোহফা', বাংলায় তরজমা ক'রেছেন, "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের" মত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা ক'রতে গিয়েও কোনোরূপ ক্লেশ অনুভব করেননি, শুধু ক্লেশ অনুভব ক'রলেন ঊনিশ শতকের বাংলা গদ্যে 'বেদান্ত

৫। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩; (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকা)।

৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৯।

গ্রন্থে'র তরজমা করতে গিয়ে ! শুধু তাই নয়—রামমোহন এ কথাও বুঝতে পারলেন যে, বাংলা গদ্যে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করা হয়ত সম্ভব হবে, কিন্তু সে গদ্যের যে রূপ দাঁড়াবে, তাতে গদ্য-পাঠকের পক্ষে তার অর্থোদ্ধারও সহজসাধ্য হবে না। তাই তিনি লিখলেন—"যাহাদের সংস্কৃতে বুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন, যাহা, যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন, তাহা, সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবত ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"[৭]

ইতিহাসের কথা চিন্তা করলে বাংলা গদ্যে রামমোহন রায়কে প্রথম সচেতন শিল্পী ব'লতে হয়, যিনি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেন এবং তার সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন। এই প্রসংগে একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে, বাংলা পয়ার ত্রিপদীর ছোট ছোট সরল বাক্য-রীতির দেশে গদ্য-রচনার অজুহাতে সুদীর্ঘ ও জটিল রচনা-রীতির আমদানী করেছিলো কারা, যার জন্য বাংলা গদ্য এমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিলো ? হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তো তার কোনো নমুনা নেই !

এর জবাব অতি সোজা। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতিরা বাংলা গদ্যের আরবী-ফারসী তথা মুসলমানী ভাবধারা বর্জন ক'রেই শুধু খুশী ছিলেন না, তাঁরা এই নবসৃষ্ট গদ্য সাহিত্যকে সংস্কৃতের আবরণে পুরোপুরি ইউরোপীয় ছাঁচে গ'ড়ে তুলতেও সচেষ্ট ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়মে গদ্য সাহিত্য নিয়ে এর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। রামরাম-মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের সেই প্রয়াসকে

৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৯।

বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রাণপণ কোশেশ করেছিলেন। ফলে বাংলা গদ্য সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত হ'য়েছিল।[৮] এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা যাচ্ছে। তার আগে বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্যিক রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলে নেওয়া যাক।

বিদ্যাসাগর—"বাংলা গদ্যের নিউটন"

মৃত্যুঞ্জয়—রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্য একটি বিশিষ্ট রূপ পাওয়ার পর এলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন বটে, তবে তিনি ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়েও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; ফলে কেরী-মার্শম্যান অভিলষিত ইংরিজি বাক্যগঠন রীতির বৈশিষ্ট্য, তার সৌন্দর্য ও ছন্দবোধের মর্মকথাটি তিনি উপলব্ধি করে বাংলা গদ্যের সঙ্গে তার সার্থক সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। রাজা রামমোহনের মতো বিদগ্ধ মনীষীর দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, বিদ্যাসাগর সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছেন! বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই কীর্তির তুলনা নেই। ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাই বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের নিউটন' নামে অভিহিত করেছেন।[৯] ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা পদ্যের মত গদ্যেরও যে একটি নিজস্ব গতি বা ছন্দ আছে, এ আবিষ্কার বিদ্যাসাগরেরই অভিনব কীর্তি। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের সংগে তা তুলনীয়। গদ্যে নিজস্বভাবে 'সার্থ পর্ব' (Sense group) ও 'শ্বাস পর্ব' (Breath group) অনুসারে বাক্য মধ্যে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির অজস্র অথচ পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে, ইংরিজি ভাষা থেকে , (কমা) ; (সেমিকোলন) ইত্যাদি ছেদ চিহ্ন

৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিক, 'বাংলা গদ্যের খাতবদল' প্রবন্ধ।

৯। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, ১ম খন্ড, ভূমিকা।

ধার ক'রে বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যবহার করেন।[১০] কিন্তু বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন রায়ের রচনাতেও আমরা , ; — ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করি। শুধু তাই নয়, রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণে (গৌড়ভাষার ব্যাকরণ) এর সুষ্ঠু ব্যবহারের নজীর বিরল নয়। তাঁর পূর্বেও এর অল্প-স্বল্প ব্যবহার ছিল। এখানে আমাদেরকে একটু থামতে হল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্য ও একজন অজ্ঞাতনামা গদ্য লেখকের কথা ঃ

সম্প্রতি প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে এরূপ প্রমাণ মিলছে যে, বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অন্তত নয় বৎসর পূর্বে বাংলা গদ্যের এই অনাবিষ্কৃত ছন্দস্রোত আবিষ্কৃত হ'য়েছিলো— একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের দ্বারা ১২৪৫ সনে (১৮৩৮ ঈ)। এবং এই লেখকের ভাষা বিদ্যাসাগর রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র (১৮৪৭ ঈ) ভাষা থেকে অধিকতর উন্নত ও মার্জিত। গ্রন্থকার অজ্ঞাতনামা, কিন্তু গ্রন্থকারের রচনা-পদ্ধতি, ভাষা ও মানস-ভঙ্গির পার্থক্য তাঁকে সুস্পষ্টভাবে একজন মুসলিম সন্তান বলে চিহ্নিত করে। ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংগে সম্পর্কশূন্য ও অজ্ঞাতকুলশীল লেখক ও তাঁর গ্রন্থ সবে মিলে আমাদের গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।[১১]

পাঠকদের অবগতির জন্য সমকালীন দু'জন শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের রচনার সংগে উক্ত লেখকের রচনার লঘু ও গুরু হিসেবে দু'টি করে নমুনা পেশ ক'রছি।

১০। চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ১৮৩।

১১। মুহম্মদ আবু তালিব—মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা, রাজশাহী, ১৭৭৩ বাংলা ১৯৬৬ ঈসায়ী (ডক্টর মুহমদ শহীদুল্লাহ অভিমত)।

হযরত শাহ মখদুম—১৮৩৮ (১২৪৫ সাল):

(ক) "(তাঁহার) কবরের বুকস্থানে একটি পাথর। ঐ পাথরের উপর দৃষ্টি করিলে কত রঙ-বেরঙের ফুলবাগ ও ঘরবাড়ী দেখা যায় এবং কবরের পায়ের দিকে একটি ছিদ্র। ঐ ছিদ্রের মধ্যে একটি কঙ্করকণা বা ছোট ঢিল প্রবেশ করাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে কোন সুগভীর পানিতে পড়িবার মত 'টুবুক' শব্দ শোনা যায় এবং প্রতি নামাজের সময় ওজু করিয়া মসজিদে যাইবার সম্পূর্ণ পদচিহ্ন দেখা যায়। তাঁহার বহু কেরামত মাশহুর রহিয়াছে। ইহার জাহেরী কেরামত লিখিত হইলে বড় পুস্তক হইয়া পড়িবে।[১২]

(খ) "বনবাসী দৈত্য রাজের নিকটে পলাতক দৈত্য ধর্মাবলম্বিগণ পুনরায় সমবেত হইয়া রাজ আজ্ঞায় জয়ের আশীর্বাদ গ্রহণে তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য বহু দৈত্য ধর্মাবলম্বী রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তৎ-সংবাদে মখদুম সাহেব বোয়ালিয়ায় আগমন করতঃ সমবেত দৈত্যধর্মাবলম্বীদলের মধ্যে পাক পা হইতে ১ পাট খড়ম ফেলাইয়া মারিলেন। হুহুঙ্কার রবে বিঘূর্ণিত খড়মের আঘাতে বিস্তর দৈত্য ধরাশায়ী হইল ও কতক পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। এদিকে দৈত্যরাজের ২টি মাত্র পুত্রই রক্ত উঠিয়া মারা গেল। দৈত্যরাজদ্বয়ের প্রকৃত ধর্ম উন্মিলন হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাজপরিজনসহ মৃত পুত্রের লাশ লইয়া আসিয়া মখদুম সদনে রাখিয়া দিয়া তার পায়ের উপর পড়িয়া গেল। বিপদের কাণ্ডারী দয়াময় মখদুম মৃত লাশদ্বয়ের হাত ধরিয়া "ঘুমাও যাত উঠ" বলিলেন। মৃত পুত্রদ্বয় উঠিয়া বসিল।[১৩]

প্রবোধ চন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৮১৩):

(ক) "অকারাদি ক্ষকারান্তর মালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা কিংবা সপ্ত পঞ্চাশত সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী

১২। পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৮.
১৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

বিন্যাসবিশেষ বশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত -প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষ বশতঃ অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র্য শাস্ত্রোত লোকতর প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জর ধ্বনি-তুল্য ধ্বনি নিষাদস্বর। গোর-বানুকারি ঋষভ স্বর"।[১৪]

(খ) "শ্রীল শ্রী বিক্রমাদিত্য ভূপালতনয় শ্রীল শ্রী বৈজপালাভিধান ধরণীপাল ছিলেন। তিনি একদা সর্ব্ববিষয়ভাজন সভাজন মধ্যে অধ্যাসীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে দধীচির অস্থি বজ্র-সারময় ছিল এবং কর্ণের চর্ম অভেদ্য বর্মের ন্যায় ছিল তাঁহারাও এ ভূতলে বহুকাল রহেন নাই সম্প্রতি তাহাদের সেই শরীরও নাই ও সে বিভবও নাই ও সে রাজ্যাধিকারো নাই কিন্তু ঐ দধীচির স্বমরণ স্বীকারপূর্ব্বক বজ্রনির্মাণার্থ অস্থিদানজনিত কীর্ত্তিমাত্র ও কর্ণের যে অক্ষয় কবচ মাহাত্ম্যে চর্মবর্মের ন্যায় ছিল সে অক্ষয় কবচের স্বমৃত্যু স্বীকার যাচককে দানজন্য যশোমাত্র আছে।"[১৫]

বেতাল পঞ্চবিংশতি—বিদ্যাসাগর :

(ক) "বেতাল কহিল মহারাজ! ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে, অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে, পুষ্পসর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্ব্বরাজ জীমূৎকেন্দ্র ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি, পুত্র কামনা করিয়া, বহুকাল কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলে, রাজা জীমূৎকেতুর এক পুত্র জন্মিল। জীমূৎবাহন, স্বভাবতঃ সাতিশয় ধর্ম্মশীল, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; এবং স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্পকাল মধ্যে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শাস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।"[১৬]

১৪। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—প্রবোধ চন্দ্রিকা, প্রকাশ—১৮৩৩ পৃঃ ১ (রচনা ১৮১৩)

১৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।

১৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, পৃঃ ২০৪। (সং—১৩৬৯ = ১৯৬২) রচনা—১৮৪৭ ইং।

(খ) "রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন ; এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুল হৃদয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল।"[১৭]

প্রত্যেক লেখকের রচনারীতির 'লঘু' ও 'গুরু' হিসেবে দু'টি করে নমুনা পেশ করা গেল। এদের রচনাকাল যথাক্রমে ১৮৩৮, ১৮৯৩ (প্রকাশ ১৮৩৩) ও ১৮৪৭। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতির মধ্যবর্তী সময়ের রচনা। অথচ রচনা-রীতির দিক দিয়ে এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

বিদ্যাসাগরের রচনারীতি বিদ্যালঙ্কারের রচনারীতির বিবর্তিত এবং সরলতর রূপ সন্দেহ নেই, কিন্তু 'শাহ মখদুম জীবনী'র রচনারীতি এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে হয়। বিশেষ করে তার প্রথম নমুনাটি একেবারে বিপরীত কোটির। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, লেখক তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের ভাষাই ব্যবহার করেছেন, এবং সংস্কৃতায়িত শব্দের পাশে আরবী-ফারসী শব্দাবলীরও স্থান দিয়েছেন। অথচ সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। বরং তদ্দ্বারা বাক্যগুলি অধিকতর প্রকাশক্ষম এবং সুন্দর হ'য়েছে। এর পার্শ্বে ১৮০১ সালে রচিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র একটু নমুনা দিই :

"যেকালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হুমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্টী তাহার অনেক গুনিল (গুলিন ?) সন্তান তাহারদের আপনারদের

১৭। বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, পৃঃ ৬০-৬১, ১ম প্র, ১৩৬৪।

মধ্যে আত্মকলহ লইয়া বিস্তর বিস্তর ঝগড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবা-জাতের তহশিল তাগাদা কিছু হইয়াছিল না। এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সৈন্য সজ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্যন্ত তিন সুবার কর্ত্তৃত্ব নিষ্করে করিলেন ইহাতে ভান্ডারা-বাঁধ ধনে পরিপূর্ণ করিলেন।"[১৮]

লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এই যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' ভাষা ছিল সমকালীন চলিত ভাষার আদলে রচিত; তাই উপযুক্ত অনুশীলনী হলে, এ-ভাষা সহজেই 'শাহ মখদুম জীবনী'র ভাষায় রূপান্তরিত হ'তে পারত এ-কথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি কেউ কেউ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' ভাষার কোন কোন অংশের প্রশংসা করলেও সমকালীন পৃষ্ঠপোষকদের নিকট বইখানির ভাষা নিন্দিত বৈ প্রশংসিত হয়নি ; পরবর্তী সমালোচকেরাও তার যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর সুশীল কুমার দে (এস-কে-দে) প্রমুখ। শাস্ত্রী মশায় তো স্পষ্টই বলেছেন, "এইবার তোমাদের বড় লজ্জার কথা। বিদেশীদের উৎসাহে বিদেশীয়দিগের উপকারার্থে বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পন্ডিত কর্ত্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। তোমাদের প্রথম গদ্য লেখক ফরেস্ট ও কেরী, আর একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া। তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালার সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই একজন বাঙ্গালী এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের পুস্তক কদর্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র ও প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাঙ্গালীর লেখা "দুইখানিই অপাঠ্য।"[১৯]

১৮। রামরাম বসু—প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১ ইং।
ডক্টর এস-কে-দে'র "The History of Bengali Literature in the nineteenth Century" গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৭-৬৮।

১৯। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী। বসুমতি, কলিকাতা। পৃঃ ২৩৩।
(বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ সাল থেকে পুণর্মুদ্রিত)।

ডক্টর দে'র মন্তব্যও প্রায় অনুরূপ।[২০] কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জওয়াব পাওয়া যায়নি।

শাস্ত্রী মশায়ের মন্তব্য শুনলে মনে হয়, ইতিপূর্বে বুঝি আর বাংলা সাহিত্যই ছিল না, গদ্য সাহিত্য তো দূরের কথা! অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা ক'রলে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষার প্রশংসা বৈ নিন্দা করা যায় না। পক্ষান্তরে ডক্টর সুকুমার সেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন—

"(রামরামের রচনা রীতি)—সহজ মুখের ভাষার কাছাকাছি এবং সেই কারণেই তাহাতে ফারসী শব্দও প্রয়োগের বাহুল্য"[২১] পক্ষান্তরে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা—"দুরূহ, মুখের ভাষার মত নয় এবং কঠিন সংস্কৃত শব্দে ও সমাসে পরিপূর্ণ।"[২২] কিন্তু তথাপি কৌতুহলের বিষয়, "মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে আসিয়া কেরী সংস্কৃতের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য-পুস্তকগুলির ভাষায় সংস্কৃতের ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ের স্টাইলের মূল্য বাড়িতে লাগিল।"[২৩] ফল এই হ'ল যে, অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা তার পূর্বতন স্বাভাবিক ধারাচ্যুত হ'য়ে সম্পূর্ণ এক কৃত্রিম খাতে প্রবাহিত হ'ল এবং তা মূল ভাষাপ্রবাহ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।[২৪]

হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ ঃ "আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞ"

বাংলা সাহিত্যের মশহুর ঐতিহাসিক সজনীকান্ত দাস তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ফোর্ট উইলিয়মীয় পন্ডিত সমাজের

২০। ডঃ এস-কে-দে—পূর্বোক্ত।

২১। ডকটর সুকুমার সেন। বা-সা-ই। ৫ম সং। কলি, ১৩৭০। পৃঃ ১১।

২২। —পূর্বোক্ত। পৃঃ ১১।

২৩। — — পৃঃ ১০।

২৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত।

এই ভাষা সংস্কার প্রয়াসকে স্পষ্টই 'আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞ' নামে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই পণ্ডিত সমাজের হাতে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও তার পরিবৃদ্ধির এক 'কৌতুহলোদ্দীপক ও চমকপ্রদ বিবৃতিও দান করেছেন। সজনীকান্ত লিখেছেন—"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে 'আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালত সমূহে আরবী ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আরবী-পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধপদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হইয়াছিল।[২৫] এর সহজ অর্থ এই যে, বাংলা ভাষাই 'সংস্কৃত' হ'য়ে উঠেছিলো। এই কীর্তির মূলে বিশেষ করে তিনজন কীর্তিমান পুরুষের নাম পাওয়া যাচ্ছে; তাঁরা হ'লেন—যথাক্রমে হেনরী পিটস ফরস্টার, ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০), এবং উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। এ'দের এই কার্যে পরে সাহায্য করেছিলেন—যোশুয়া ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭)। ইনিই মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভূমিকা লিখেছিলেন (১৮৩৩ ইং)। এবং মজার ব্যাপার এই যে, এই যজ্ঞের হোতা হ্যালহেড সাহেব ১৭৭৮ সালে ইংরাজি ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন,—(A Grammar of the Bengali Language), তাতে তিনি বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দ ও ভাবধারা আমদানী ক'রে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট ক'রবার জন্য পূর্বতন মুসলিম শাসকদের জুলুমের দোহাই দিয়েছেন। তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দ স্বাভাবিকভাবে আসেনি, তাকে

২৫। সজনী কান্ত দাস—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃতিকরণ অধ্যায়। পৃঃ ৩২—৩৩।

জবরান ঢোকানো হ'য়েছে এবং তাঁরা (হ্যালহেড সাহেবেরা) সেই ফারসীর দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে তাকে স্বাধীন বিশুদ্ধ বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার নেক নিয়তে আরবী-ফারসী নিসূদন যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছেন।[২৬] পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতেই এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয় এবং পরে ফারসীর বদলে ইংরিজিকে রাজভাষার মর্যাদা দেওয়ায় এর সকল ভবিষ্যত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করা হয়। অবশ্য হ্যালহেড সাহেবের বইখানি মুদ্রণ জগতের ইতিহাসে আলোড়ন এনেছে। বাংলা ভাষাও তাতে উপকৃত হয়েছে। যেহেতু বইখানি বাংলা ভাষা সংক্রান্ত, তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা হরফ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে শাপে বর হয়েছিল। বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফারসী বর্জনের প্রয়াস থাকলেও বাংলা হরফ মুদ্রণের ফলে মুদ্রণ জগতে বিপ্লবের সূত্রপাত হ'য়েছিল। এবং কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, এই যজ্ঞধূমে নিঃশ্বেষিত হ'তে না হ'তেই 'শাহ মখদুম' জীবনী রচিত হওয়ায় সেই মরণ-পুরীতে যেন জীবনের শেষ রশ্মিপাত হতে দেখা গেল। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে 'শাহ মখদুম জীবনী' তাই এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

শুধু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনা ব'লে নয়, নানা-দিক দিয়ে গ্রন্থখানি গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থখানি সম্পর্কে তাই বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

"শাহ মখদুম জীবনী" ও তার ভাষা-রীতি ঃ

'শাহ মখদুম জীবনী' সংক্ষিপ্ত নাম। প্রাপ্ত কলমী পুঁথিখানির প্রথমেই লিখিত আছে যে, এখানি—'হযরত শাহ মখদুম সাহেবের বাঙ্গালা দেশের জীবনী তোয়ারিখ। উক্ত গ্রন্থ থেকেই জানা যায়—রাজশাহীর বিখ্যাত দরবীশ হযরত শাহ মখদুম সাহেবের একখানি প্রাচীন জীবনী গ্রন্থ অবলম্বনে এই বাংলা গ্রন্থখানি রচিত হ'য়েছে

২৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪।

১২৪৫ সালে (১৮৩৮ ঈ)। মূল ফারসী গ্রন্থখানির রচনাকাল ১০৭৬ হিজরী (—১৬৬৫-৬৬ ঈ)। সম্রাট আওরঙ্গজীবের নির্দেশ মোতাবেক এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে বলেও উল্লিখিত আছে। বাংলা পুথিখানি ১০"×১১" সাইজের ২৯ পৃষ্ঠার বই। এখানে ভূমিকাটি উদ্ধৃত করছি ঃ

'হজরত শাহ মখদুম সাহেবের বাঙ্গালা দেশের জীবনী তোয়ারিখ যাহা সেরেস্তার দপ্তরে ছিল তাহা জরাজীর্ণ হইতে থাকায় তাহা তখন নকল করিবার সময় মাননীয় মৌলবী সৈয়দ এব্রাহিম হোসেন সেরেস্তাদার, মৌলবী সৈয়দ মোরদার হোসেন উকিল সাহেব, সৈয়দ মছিরতুল্যা সদরে আলা, ও মৌলবী আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবানের যত্নে ও চেষ্টায় এই কাগজের বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা করাইয়া লয়েন এবং অত্র খন্ড আসল কাগজের সহিত মখদুম সেরেস্তার কাগজাতের সামিল করা গেল, ইতি। সন ১২৪৫ সন বাঙ্গালা ১১ই আশ্বিন (মূল পুথি, পৃঃ ১)।

এই মশহুর দরবীশ রাজশাহীর (তৎকালীন রামপুর) মহাকাল গড়ের পরাক্রান্তশীল তান্ত্রিক রাজভ্রাতৃদ্বয়কে (অংশুদেও চান্দভন্ডী বর্মভোজ ও অংশুদেও খেজ্জুর চান্দ খড়া বর্মগুজ্জ ভোজ) পরাজিত করে মহাকালগড় রাজ্য দখল করেন (৭২৬ হিঃ=১৩২৬ ঈ)। প্রকাশ, ইতিপূর্বেই তুরকান শাহ ও অন্যান্য কতিপয় দরবীশ এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসে গড়াধিপতিদের নির্দেশে নিহত হওয়ার সংবাদ বাগদাদের বড়পীর হযরত মহীয়্যুদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রঃ)-র দরগাহ থেকে এই ছদ্মবেশী 'শাহ মখদুম রূপোশ'[২৭] নাম ধারণ ক'রে এই এলাকায় আসেন (৬৮৭ হিঃ ১২৮৮-৮৯) এবং রাজশাহী জিলার 'বাঘা' নামক স্থানে একটি কেল্লা নির্মাণ ক'রে

২৭। রূপোশ (روپوش) ফারসী শব্দ মানে মুখ আবরণকারী বা ছদ্মবেশী। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, এই দরবীশের আসল নাম হযরত আবদুল কুদ্দুস ওরফে শাহ মখদুম (রঃ) এবং ইনি হযরত বড় পীর সাহেবের পৌত্র ছিলেন।

কিছুদিন অবস্থান করেন। স্থানটি 'মখদুম নগর' নামে পরিচিত হয়। পরে এই স্থান থেকেই এক নাপিত পুত্রকে মহাকালগড়ের রাজার কবল থেকে রক্ষার নিমিত্ত গড় আক্রমণ ও দখল করেন। মহাকাল গড়ে মুসলিম শাসন কায়েম হয় এবং শাহ মখদুম (রঃ) সেখানকার পার্থিব এবং অধ্যাত্ম উভয় রাজ্যেরই 'রাজা' ও 'শাহ' নামে পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই রাজা ও শাহের স্মৃতি-সূচক নামই 'রাজশাহী' জিলা ও শহর হয়েছে।

অদ্যাবধি এইস্থানে শাহ মখদুমের মাজার ও দরগাহ অবস্থিত র'য়েছে। স্থানটি শাহ মাখদুমের দরগাহের নামে 'দরগাহপাড়া' নামেও পরিচিত। শাহ মখদুম জীবনী তাই শুধু দেশের ইতিহাসেই নয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের ভাষাতেই বলা যায়—

"ইহা কেবল এক পীরের জীবনী নয় বরং রাজশাহীর ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের আবিষ্কার। পীর সাহেবের জীবনী মূলে ফারসী ভাষায় লিখিত, কিন্তু তাহার বঙ্গানুবাদ হয় ১২৪৫ সনে। আমাদের জ্ঞানানুসারে ইহাই মুসলিম বঙ্গের প্রাচীনতম গদ্য রচনা। সুতরাং ইহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় বলিতে হয়।"[২৮] কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই নূতন অধ্যায়টি আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই আমাদের আধুনিক সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে বাঙালী মুসলমানের সাধনার স্বীকৃতি আদায় করা কঠিন হ'চ্ছে।

২৮। মুহম্মদ আবু তালিব—পূর্বোক্ত। দো-আ-ই খায়ের রাজশাহী, ১৩৭৩ সাল। মূল গ্রন্থটি সম্প্রতি বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। [২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বা (=১৯৬৭)]। ও
"হযরত শাহ মখদুম রূপোশ আউলিয়ার ফারসী ভাষায় লিখিত জীবনী তোয়ারিক জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন ফারসী গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় তিন কিতা জীবনচরিত রচনা করা হইল ও দুই কিতা মখদুম সেরেস্তায় দাখিল করা হইল।" রাজশাহী কালেকটরেট রেকর্ড রুমে রক্ষিত নথি (vol 4, P, 8)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শাহ মখদুম জীবনীর মূল লেখকের নাম পাওয়া যায়নি, তাই তাঁকে মুসলিম লেখক ব'লে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত কিনা, এরূপ প্রশ্ন কারও কারও মনে জেগেছে। এ প্রশ্নের সহজ জবাব এই যে, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান একই দেশে একই পরিবেশে মানুষ হ'য়েও যেমন স্বতন্ত্র তাহযীব-তমদ্দুনের অধিকারী হয়ে উঠে এবং তার পরিচয় না দিলেও তাদের পার্থক্য একজন বিদেশীর কাছেও সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠে, শাহ মখদুম জীবনীও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর ভাষা, রচনা-রীতি এমনকি ভাবাবহে এমন একটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, যার ফলে তার জাতি পরিচয় এক রকম নিঃসংশয়িত। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবও এ রচনাকে মুসলমানের রচনা ব'লে স্বীকার ক'রতে ইতস্ততঃ করেননি। তথাপি সুধী সমাজের অবগতির জন্য আমরা গ্রন্থকারের মুসলমানিত্বের স্বপক্ষে দু-একটি সাক্ষ্য হাযির করছি—

আগেই বলেছি, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা নির্মীয়মান বাংলা গদ্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবী-ফারসী শব্দ বর্জন ক'রেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন, মুসলমান রাজত্বকালে মুসলিম শাসকরা 'জবরান'—এই সব শব্দ বাংলা ভাষায় আমদানী ক'রেছিলেন, তাই তাঁরা বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য এই শব্দ বর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য, ফোর্ট উইলিয়মের হিন্দু পন্ডিতগণ এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলমান কবিরা আরবী-ফারসী শব্দাবলীকে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ মনে করে তা বর্জন করতে রাজী হননি। বাংলা তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানি পুথি-সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে! বাংলা গদ্যে তাঁরা কি করেছিলেন, তার কোনো নমুনা ইতিপূর্বে প্রাপ্ত না হওয়ায় মুসলিম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সমকালীন মুসলিম গদ্যের নমুনা উদ্ধৃত হ'য়েছে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম পদ্য সাহিত্যের মত গদ্য সাহিত্যেও প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার মুসলিম মানস-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করছে। আর

তা ছাড়া এর মধ্যে এমন কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা শুধুমাত্র মুসলিম সমাজেই প্রচলিত। লেখক অমুসলিম হ'লে শব্দগুলি কিছুতেই এই গ্রন্থের অন্তর্গত হতে পারতো না। যথা,—

(ক) 'মৃতদেহ' অর্থে লেখক 'লাশ' শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন, যথা--

'রাজপরিজন সহ মৃতপুত্রের 'লাশ' লইয়া আসিয়া মখদুম সদনে রাখিয়া দিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল'।

এই 'লাশ' একমাত্র মুসলিম সমাজেই ব্যবহৃত হয়। লেখক হিন্দু হ'লে একে 'শব' অথবা 'মড়া' বলতেন।

(খ) সমাধি অর্থে 'কবর' ও 'মাজার' ব্যবহৃত হ'য়েছে। অমুসলিম লেখক এরূপ স্থলে--'সমাধি', 'স্মৃতিসৌধ' ইত্যাদি লিখতেন।

(গ) 'বড় দাতা' অর্থে 'হাতেম দেল' ব্যবহৃত হ'য়েছে--

(মুনশী জওয়াদুল হক সাহেব)—'একজন মহাবিদ্বান, ধার্মিক, হাতেম দেল, অসাধারণ ক্ষমতাশালী-মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু লেখক এখানে 'দাতা কর্ণ' লেখার লোভ সামলাতে পারতেন ব'লে মনে হয় না।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত 'চেল্লাকুশী' (পীরের দরগায় অনাহারী অবস্থায় বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এবাদত বন্দেগীতে রত থাকা) 'বুজর্গী হাসিল' (সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা) ইত্যাদি শব্দ কোনো অমুসলিম লেখকের কলমে আসা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং বলা প্রয়োজন যে, সমকালীন সাধু গদ্যে এই ধরনের কোন শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্তও নেই।

'শাহ্ মখদুমী' বনাম 'সাগরী রীতি'

বলা হ'য়েছে যে, আধুনিক বাংলা গদ্যে শব্দ সমন্বয় ও বাক্য বিন্যাসের যে কঠিন সমস্যা ছিল, রাজা রামমোহন রায়ই তা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন এবং তা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হ'তে পারেননি। এমনকি রামমোহনের পরেও বহুদিন এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় "রামমোহনের পর বাংলা গদ্য রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।......... রামমোহন বাংলা গদ্যের একটি নিজস্ব রীতি যতটুকু প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন এবং গদ্য ভাষাকে যে স্তরে উন্নীত ক'রেছিলেন, প্রায় সেই স্তরেই তা দীর্ঘকাল স্থিতিশীল হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমারের যুগে বাংলা গদ্য রীতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, এবং এই সময় বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"[২৯] কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি—কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত না হ'য়েও শাহ মখদুম জীবনীর লেখক রামমোহন—বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তীকালে এই কঠিন-সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, যদিও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসবিদরা তাঁর কোনো সন্ধান রাখেন না। আমরা তাঁর এই রচনা-রীতিকে 'শাহ মখদুমী রীতি' নামে অভিহিত করতে পারি।

'মখদুমী রীতি' বলতে অবিশ্যি মখদুম জীবনীতে ব্যবহৃত রচনা-রীতি বুঝতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, মখদুমী রীতিই পরবর্তী 'আলালী রীতি'র পথ প্রদর্শক, এ-কথা বললে অন্যায় বলা হয় না। শাহ মখদুম জীবনীর লেখক ফোর্ট উইলিয়ম যুগের রচনা-রীতির সংগে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থের ভাষা থেকেই তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়, তবে সেই পন্ডিতদের উৎকট সংস্কৃত-প্রীতি ও ইংরিজি-প্রীতির কোনোটাই তাঁর মধ্যে ছিলো না। শব্দ সমন্বয় ও বাক্যগঠন রীতিও ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কৃতাশ্রিত শব্দ গ্রহণে যেমন ইতস্ততঃ করেননি, তেমনি আরবী-ফারসী শব্দাবলী গ্রহণেও নিতান্তই নিঃসংকোচ ছিলেন। তাই বলা যেতে পারে যে, সেই প্রাথমিক যুগের বাংলা গদ্যের তিনিই একমাত্র লেখক যিনি স্বাভাবিক ও খাঁটি বাংলা রীতির

২৯। বিনয় ঘোষ—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃঃ ৬১০-১১, ১ম সংখ্যা ভাদ্র—১৩৬৬।

স্বরূপে উপলব্ধি ক'রে বাংলা গদ্যে তা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন এবং বলা বাহুল্য, সে-জন্যে তাঁকে ইংরিজি বা সংস্কৃতের দ্বারেও ধর্ণা দিতে হয়নি। তাই দেখতে পাই, সুপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ-সম্পদের পাশে সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্দ-সম্পদ অত্যন্ত সহৃদয় সম্বন্ধ স্থাপন করে অবস্থিতি করছে। এমনকি বিদেশী (ইংরিজি) ছেদচিহ্ন যথা—কমা (,), উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ইত্যাদি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। সবচেয়ে বড় কথা, সুবিন্যস্ত শব্দরাজি ও সুষম বাক্য গঠন কার্যে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সমকালীন বাংলা গদ্যে যা ছিল কল্পনারও অতীত। তাঁর রচনা রীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তাঁর বাক্য-গুলির অধিকাংশই ছোট ছোট এবং কাটা কাটা। পড়তে লাগলে মনে হয় যেন প্রাচীন বাংলার পয়ার-ত্রিপদীর ললিত ছন্দে লেখা কবিতাকলিগুলি গদ্যরূপে সাজানো হ'য়েছে। অথচ কোথাও এতটুকু আয়াসের চিহ্নও নেই। ফলে ছেদ চিহ্নাদিরও বড় বেশী প্রয়োজন হয়নি। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগরের বাক্যের বহর অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল। ফলে, ছেদচিহ্নের বাহুল্যে তার স্বাভাবিক গতিও অনেকটা ব্যাহত হ'য়েছে। তুলনামূলক আলোচনার জন্য পাশাপাশি এই দুই রচনা-রীতির নমুনা দেওয়া যাচ্ছে।

(ক) নাপিত বলে / হে দেবতা / মোছলমান রাজা / এথানে / অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন / ।।

বলিলেন / সেই আমি / রাজা নহি / ।।

আমি মখদুম / ।।[৩০]

(খ) তিনি (মুনশী জওয়াদুল হক) একজন / মহা বিদ্বান, / হাতেম দেল / অসাধারণ / ক্ষমতাশালী / মহাপ্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন / ।।

তিনি নিয়ত / রাত্রি যোগে / আস্তানা মাজারে আসিয়া / এবাদত করিতেন, ও / চেল্লাকুশি করিতেন / ।।[৩১]

৩০। মুহম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩৫।
৩১। পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৪।

লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃত অংশে আরবী-ফারসী শব্দাবলী সংস্কৃত ও সংস্কৃতাশ্রিত শব্দের পাশে স্থান পেয়েছে, বিজাতীয় বলে বর্জিত হয়নি। আর বাক্যগুলিও নেহায়েত ছোট, সুন্দর ও সুগঠিত।

তুলনীয় বিদ্যাসাগরের –

(ক) "কিয়দ্দিনান্তর / রাজা মনে মনে / এই বিবেচনা করিলেন। জগদীশ্বর আমাকে / নানা জনপদের / অধিপতি করিয়া / অসংখ্য প্রজাগণের / হিতাহিত চিন্তার / ভার দিয়াছেন / কিন্তু আমি / আত্মসুখে নিবৃত্ত হইয়া / তাহাদের অবস্থার প্রতি / ক্ষণ মাত্রও / দৃষ্টিপাত করি না / কেবল / অধিকৃতেরদের বিবেচনার উপর / নির্ভর করিয়া / নিশ্চিন্ত রহিয়াছি।[৩২]

(খ) জ্ঞানশ্রীর / জ্ঞানোদয় হইল; তখন সে / প্রিয়তমাকে / মৃত স্থির করিয়া / সখীর নিকট গিয়া / পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার / তাহার গোচর করিয়া কহিল / সখি / আমি / এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করি / বল।[৩৩]

বিদ্যাসাগরের শেষোক্ত রচনা-রীতির সংগে 'শাহ মথদুমী' রচনা-রীতির সাদৃশ্য থাকলেও তাতে আরবী-ফারসী শব্দের নিশানা মাত্র নেই, অথচ 'শাহ মথদুমী' রীতির উদ্ভবকাল 'সাগরী-রীতি'র মাত্র নয় বৎসর পূর্বে। তবে দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর গ্রন্থখানি ছাপা হ'য়ে প্রকাশিত না হওয়ায় আমাদের সুধী সমাজ এই রচনা-রীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ পাননি। হ'লে সমকালীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান নির্ণয়ে সুবিধে হ'তে পারত। পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগরীয় গদ্য-রীতি সমকালীন সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর গদ্য-রীতি সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"বাংলা ভাষার পূর্ব প্রচলিত অনাবশ্যক

৩২। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' থেকে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত। কলি, ১৩৫৬ বা (= ১৯৩৯)। ৩য় সং। পৃঃ ৬০।

৩৩। পূর্বোক্ত। পৃঃ ৬১।

সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকারব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন—তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"[৩৪] বলাবাহুল্য, সমকালে সুপ্রচলিত না হ'লেও তুলনামূলকভাবে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 'শাহ মখদুমী' রীতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। তবে 'শাহ মখদুমী' রীতি সম্পর্কে এই সংগে আরও একটি কথা স্মরণীয় যে, তিনি বাংলা ভাষাকে 'পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্যভাষা' রূপে না দেখে তাকে স্বাধীন বাংলা ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। খুব সম্ভব, সমকালীন মুসলিম লেখকদের অনেকেই এই ভাষা রীতির সমর্থক ছিলেন, এবং এটিই ছিল স্বাভাবিক। সমকালীন লালন শাহ, জামাল উদ্দীন, মুহম্মদ খাতের, মালে মুহম্মদ প্রমুখ কবির ভাষা-রীতির দিকে তাকালে এটি সুস্পষ্ট হয়। আলোচ্য লেখকও তাই ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতকুলের অভিলাষিত পথে না গিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া বাংলা জবানের ক্রম-পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন—ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা যার প্রতি অবহেলা ক'রেছিলেন।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চরিত্রপূজা। পৃঃ ১১।

লালনশাহী বাংলা—বাঙালীর দিন-রাত্রির ভাষা

খাঁটি বাংলা ছন্দ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে কবি রবীন্দ্রনাথ সমকালীন লালন শাহ প্রমুখ তথাকথিত বাউল কবিদের কাব্যভাষাতেও এই স্বাধীন বাংলা রীতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।[৩৫] কবির ভাষায় লালনশাহী ভাষাই ছিল যথার্থ প্রাণবান' এবং 'বাঙালীর দিন-রাত্রির ভাষা'। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"ভাষা... ... সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব; বাংলা ভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তারা অর্থের মহাজন, কিন্তু যারা রূপরসিক তাদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যাঁরা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চেস্বরে
কোন পাগেলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাৎ
সেইখানে হাত
ডলা মলা।
যেমনি যেনো মনের মানুষ
মনে তোলা।। ইত্যাদি।[৩৬]

উদ্ধৃতিটি লালন-গীতির।

৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছন্দ (প্রবোধ চন্দ্র সেন সম্পাদিত)। পরিবর্ধিত সং। কলি, ১৯৬২। পৃঃ ৬১।
৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্বোক্ত। পৃঃ ১২৯।

রবীন্দ্রনাথ আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসর থেকে এই ভাষা বর্জিত হ'য়েছিল, দুর্বল বলে নয়, 'অসাধু' (অসংস্কৃত) বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা এবং তার চেহারা বলে একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি ; কিন্তু তাই বলে অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়ে মরে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রেখেছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরে সে ভদ্রসাহিত্য সভায় মোড়লী করে বেড়াতে পারে না।" শুধু তাই নয়, তিনি এরূপ আশাও ক'রেছিলেন—"এই প্রাকৃত বাংলাতে 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হ'ত সে কথা স্বীকার ক'রব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত।

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হ'ল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু রক্ষকুলের নিধি।"[৩৭]

কথা হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের ভাষা সম্পর্কে এ-কথা বলেছেন, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সংগে তার সম্পর্ক কি ? তার জবাব এই—আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে তো প্রধানতঃ গদ্য সাহিত্যই বোঝায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই গদ্য সাহিত্যেরই মুসাবিদা করা হ'য়েছিলো। বাংলা ভাষার খাঁটি-অখাঁটি, সাধু-অসাধু, গুরু-চণ্ডালীর প্রশ্নও উঠেছিল গদ্য সাহিত্যের ভাষা নিয়ে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে পরে তা সংক্রমিত হ'য়েছিল। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেই গদ্য সাহিত্যের ভাষাই

৩৭। প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ'। পৃঃ ৫১।

সহজে মনে আসে। কবির মতে, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা 'সংস্কৃতের বেড়া তুলে' এই ভাষার স্বাভাবিক গতিপথকে "ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।" এমন কি অক্ষয় কুমার-বিদ্যাসাগরের হাতে সাধু গদ্য একটি সুষ্ঠু শিল্পরূপ লাভ করার পরও এই দল 'সহজে বোঝা যায়' ব'লে এর যথেষ্ট নিন্দাবাদ করতেও ছাড়েনি। কিন্তু নিন্দাবাদের এই সব ঢক্কানিনাদ দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারেনি, এটাই আশার কথা। আরও কৌতুহলের ব্যাপার, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সরলতর করলেও তিনি সংস্কৃতায়িত বাংলা ভাষার গন্ডী অতিক্রম করে সাধারণ বাংলা ভাষার দিকে বেশীদূর অগ্রসর হননি! তাই দেখা যায়, তাঁর 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৬০) ব্যবহৃত শব্দ সম্পদের ৯২.২ ভাগই তৎসম শব্দ থেকে গৃহীত। বাকী শব্দের মধ্যে আরবী-ফারসী তথা বিদেশী শব্দ একটিও নেই! এমন কি দেশী শব্দও ০'০১ এর বেশী নেই। তাই 'বিদ্যাসাগরী রীতি'কে বাংলা নয়, সংস্কৃত রীতিরই নামান্তর বলা যায়।

এর পরেই আসেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। টেকচাঁদ 'সাগরী-রীতি'র দিকে না ঝুঁকে স্বাভাবিক বাংলা রীতির দিকে ঝুঁকলেন। ফলে এক অভিনব ভাষারীতির প্রতিষ্ঠা হ'ল। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের নামানুসারে এর নাম হ'ল 'আলালী রীতি।' এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, ইতিপূর্বেই খৃষ্টান লেখিকা মিসেস হান্না ক্যাথেরিন মুলেন্স (Hannah Katherine Mullence) লিখিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থখানি (১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৮] এবং এই গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্যারীচাঁদেরই সময়ে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'সুশীলা উপাখ্যান' নামে তিন খন্ডে একখানি পারিবারিক উপন্যাস রচনা করেন (১৮৫৯—১৮৬৩)। খুব সম্ভব, সমকালীন সাহিত্য-সমাজে 'ফুলমণি ও করুণা' কোন করুণার উদ্রেক করতে পারেনি; হয়ত বা মিশনারীদের প্রচারমূলক

৩৮। হান্না ক্যাথেরীন মুলেন্স। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ। চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৯৬৫।

কাহিনী বলে এর প্রতি হিন্দু-সমাজের বিরূপতা ছিল। কিন্তু মুলেন্সের কাহিনী যে হিন্দু-সমাজেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তার প্রমাণই সুশীলা উপাখ্যানে ফুলমণি ও করুণা গ্রন্থের উল্লেখ।[৩৯] যথা—সুশীলা উপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—"নিত্য যেরূপ করেন. চন্দ্রকুমার বাবু একদিন রাত্রিকালে ফুলমণি ও করুণার বৃত্তান্ত নামে একখানি গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে শ্রবণ করাইতেছিলেন। সুশীলা তদগতচিত্ত হইয়া ঐ মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে করিতে একটি আংরাখা সেলাই করিতেছিলেন।" লক্ষ্য করবার বিষয়, ফুলমণি ও করুণার বিবরণটি সমকালে 'মনোহর কাহিনী' হিসেবে পঠিত হত। এবং হিন্দু সুধীমহলেও এর কদর ছিল। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, গ্রন্থখানি সর্বভারতীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয়েছিল। তার ইংরিজি অনুবাদও সুপরিচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানি আমাদের ঐতিহাসিক গবেষকদের, কেন জানি না, বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। সুধী-সমাজের কৌতূহল নিবারণের জন্য ফুলমণি ও করুণা থেকে তার সাবলীল রচনারীতির সামান্য নমুনা পেশ করছি—"যখন আমাদের পরস্পর আলাপ হইতেছিল, তখন আমরা গৃহের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিলাম, কিন্তু কথা সাঙ্গ হইলে করুণার পুত্রেরা দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীন আমাকে দেখিয়া সেলাম করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাচান হইতে একটা খালি বোতল লইয়া শীঘ্র পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় তাহার মাতা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ও বংশী! তোমার কাছে যদি কিছু পয়সা থাকে তবে আমাকে দেও, আমি তাহাতে তোমাদের খাদ্যসামগ্রী কিনি, কেননা আমাদের আজি কিছুই খাইবার নাই : এবং যাহা কর বাছা, তোমার বাপের মত কোনরূপে মদ কিনিয়া খাইও না।"[৪০]

৩৯। ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস।
৪০। ফুলমণি ও করুণা। পূর্বোক্ত। পৃঃ ৬২।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মশায় মনে করেন, সুশীলা উপাখ্যানের ভাষা-রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ প্রদর্শক হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষা-রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; এমনকি এই ভাষা-রীতিকে বিদ্যাসাগরীয় ভাষা-রীতির উপরে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। 'সুশীলা উপাখ্যান' বা 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' খুব সম্ভব তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসেনি; কিন্তু না এলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-রীতির পূর্বসূরী হিসেবে 'ফুলমণি' ও 'সুশীলা উপাখ্যানের' মূল্য অনস্বীকার্য। এই হিসেবে পূর্বোক্ত 'শাহ মখদুম জীবনী'র ভাষা-রীতির কথাও স্মরণযোগ্য। শাহ মখদুম জীবনী শুধু 'ফুলমণি ও করুণা' নয়, বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতিরও পূর্বগামী। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণযোগ্য যে, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার গুরুচন্ডালী দোষ বলে যে নিন্দাবাণী উত্থিত হয়েছিল, শাহ মখদুম জীবনীর ভাষা ছিল তা থেকেও মুক্ত। পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতান্বিত সাধু ভাষা থেকেও তা নেহায়েৎ নিকৃষ্ট ছিল না। তবে দুঃখের বিষয়, বইখানি ইতিপূর্বে প্রকাশিত না হওয়ায় তার গুণাগুণের বিচার হতে পারেনি। কিন্তু আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উদ্ভূত বাংলা গদ্য একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল; যার মূলে উক্ত কলেজের পাশ্চাত্য কর্ণধারগণ ও এদেশীয় সংস্কৃত পন্ডিতগণের বিশেষ দান ছিল। সমকালীন হিন্দু পন্ডিতগণেরও যা দৃষ্টি এড়ায়নি, তাঁদেরই এক শ্রেণী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন শুধু নয়, তাঁরা ফোর্ট উইলিয়মের পন্ডিতদলের ভাষাকে 'ভট্টাচার্যের চানা' বলেও উপহাস করলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও এই ভট্টাচার্য দলের অন্তর্গত হ'লেন।

উনিশ শতকের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে এই 'গুরু-চন্ডালী' মামলার আপাত-সমাধান হলেও সত্যি কথা বলতে কি, আধুনিক বাংলা ভাষা আজও তার যথাযোগ্য

বাহন পায়নি; পূর্বোক্ত শাহ মখদুম জীবনী আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ-কথা নতুন করে ভাববার অবকাশ ঘটেছে।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদের কীর্তি'র কথা স্বীকার ক'রেও এ-কথা বলতে পারা যায় যে, 'শাহ মখদুমী' রীতির' ক্রমবিবর্তনে যে ভাষার জন্ম হওয়া উচিত ছিল, ফোর্ট উইলিয়মীয় প্রচেষ্টায় সে ধারা অবলুপ্ত হওয়ায় তা হতে পারেনি, এটি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের বিষয়। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাসাগরের ভাষাদর্শের প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সে ভাষার যে 'স্থিতিস্থাপকতা' গুণ নেই, এ-কথাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন। প্যারীচাঁদের ভাষাকেও তেমনি পূর্ণাঙ্গ ভাষা বলে গ্রহণ করতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও আপত্তি করেছেন। জনৈক আধুনিক সমালোচকের ভাষায়--"বিদ্যাসাগরের ভাষা রাজরানীর মত। হাট-বাজারে, মধ্যবিত্ত-সংসারে, সভায়-উৎসবে, বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে সে ভাষা সর্বত্রগামিনী নয়।"[৪১] প্যারীচাঁদের ভাষারও সে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু 'শাহ মখদুম জীবনী'র ভাষা এই দুর্বলতা থেকে আশ্চর্য রকমে মুক্ত। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কি ক'রে সংঘটিত হ'ল, ভেবে দেখবার বিষয় বটে। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে সর্বগুণযুক্ত করতে সমকালীন মনীষি-কুলকে কত না সাধ্য-সাধনা করতে হ'য়েছে! এমন কি,--"শ্রীরামপুর মিশন থেকে যে গদ্য লেখা হচ্ছিল, কালীপ্রসাদ ঘোষ সেদিন তার নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু যখন থেকে এ দেশী ইংরিজি শিক্ষিতরা বাংলা সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হ'লেন, তখন থেকে অলক্ষ্যে ইংরিজি ভাষারীতি বাংলা ভাষাকে নতুন রূপ দিতে আরম্ভ করল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সেই গদ্য সব প্রশ্নকে নিরস্ত করে সাহিত্যিক মহিমা অর্জন করেছে"।

৪১। পুলিন বিহারী সেন (সম্পাদিত)। রবীন্দ্রায়ণ। ১ম খণ্ড। কলি, ১৩৭৮ বা (= ১৯৬১) পৃঃ ১৩।

আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষা ঃ
জামাল উদ্দীন ও 'প্রেমরত্ন' কাব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য-পদ্য এই মহিমা অর্জনের পূর্বেই বাঙালী মুসলমান লেখকদের হাতে এর এক অভিনব ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচর্যার অভাবে সেই গদ্য ধারা অচিরেই বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হ'য়েছে। বলা বাহুল্য, আমি 'শাহ মখদুম জীবনী' (১৮৩৮) ও তার কিঞ্চিত পরবর্তীকালে রচিত জামালউদ্দীনের 'প্রেমরত্ন' (১৮৫৩) ইত্যাদি কাব্যের কথা বলছি। শাহ মখদুম জীবনীর কথা আগেই বলা হয়েছে, এবার প্রেমরত্নের কথা বলা যাচ্ছে।

শাহ মখদুম জীবনীর মত 'প্রেমরত্ন' কাব্য আমাদের সুধীমহলে আজও সুপরিচিত নয়; অথচ কলকাতা শহরের বুকেই উনিশ শতকে অন্ততঃ তার দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছিল ব'লে জানা যায়, এবং সমকালীন মুসলিম সমাজে কাব্যখানি অসাধারণ জনপ্রিয় হ'য়েছিল।[৪২] আর কাব্যগুণের কথা বলতে গেলে তো এ-কথা বলতে হয় যে, শুধু সমকালে কেন, আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একমাত্র 'মেঘনাদবধ'-এর পরেই জামালউদ্দীনের 'প্রেমরত্ন'-এর নাম করতে হয়। এবং রচনাকালের দিক দিয়েও 'প্রেমরত্ন' 'মেঘনাদবধ'-এর পূর্ববর্তী। তা ছাড়া জামালউদ্দীনের সমকালে লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০) ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), এবং রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ব্যতীত প্রকৃত কবি তেমন কেউ-ই ছিলেন না। এদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন প্রধানতঃ সাংবাদিক এবং ছড়াকার; লালন শাহ ছিলেন তথাকথিত বাউল ফকীর, মানে, লোক কবি নামে চিহ্নিত। অবশ্য কবিত্বের বিচার করতে গেলে লালনের পরে একমাত্র মধুসূদন ব্যতীত জামালউদ্দীনের সমকক্ষ আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন

৪২। মুহম্মদ আবু তালিব। জামালউদ্দীন ও প্রেমরত্ন। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ১৯৫৯।

না। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও বিধিসম্মত কবি বলতে গেলে জামালউদ্দীনকেই প্রথম কবি বলতে হয়, রঙ্গলাল ও মধুসূদন তাঁর উত্তরসূরী। জামালউদ্দীন জাতীয় সচেতন কবি, তাঁর 'প্রেমরত্ন' আধুনিক বাঙালী মুসলমানের প্রথম জাতীয় কাব্য।

এ-কথা সত্যি যে, জামালউদ্দীনের কাব্যে তথাকথিত আধুনিকতার ছাপ নেই, তবে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনি যে ইসলামী আদর্শ বা মানবতার অনুসারী, তা নিতান্তই আধুনিক জীবন ও মননের দাবীদার। আরও উল্লেখ্য যে, জামালউদ্দীন প্রমুখ মুসলিম কবিগণ যখন জাতীয় চেতনামূলক কাব্য-কবিতা রচনায় মশগুল, তখনও আধুনিক হিন্দু জাতীয়তামূলক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বিধবা বিবাহ' ইত্যাদি নাটক বা 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' (১৮৫৮), 'মেঘনাদবধ' কাব্য (১৮৬১) ইত্যাদি আধুনিক কাব্য-নাটকের পরিকল্পনাও হয়নি! জানা যায়, ১৮৫৪ সালে রঙ্গপুরের খ্যাতনামা (ফকীর কুন্ডীর) জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আহ্বানে রামনারায়ণ তর্করত্ন কৌলিন্য প্রথার অসারত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত 'কুলীনকুল সবর্বস্ব' নাটক রচনা করেন ; এবং এ-বিষয়ে প্রতিশ্রুত ৫০'০০ (পঞ্চাশ টাকা) মাত্র পুরস্কারও লাভ করেন। কবি জামালউদ্দীনের 'প্রেমরত্ন' তার এক বৎসর আগেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় (১২৬০ সাল=১৮৫৩)। অবশ্য 'কুলীনকুল সর্বস্ব' ও 'মেঘনাদবধ' রচয়িতাদের বিষয়ে আমরা কমবেশী সকলেই পরিচিত; তাই এখানে জামালউদ্দীন ও তাঁর 'প্রেমরত্ন' বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক বোধ করি। প্রথমেই তার কবিভাষা বা রচনাদর্শের সামান্য নমুনা দেওয়া যাক—।

(ক) একটি প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা : (সাধু বাংলা, বানান ঈষৎ সংশোধিত)

'কুসুম্ভভুবন ঠাম তুল্যা কি ইন্দ্রধাম
সুরপুর জিনিয়া সুদেশ।
কুসুম্ব কানন বন নানা পুষ্পে সুশোভন
ভূতলে সাজিছে স্বর্গদেশ॥

দেখি কুসুম্ব কানন কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ বন
লাজে গিয়া রহে বৃন্দাবনে।
গন্ধময় পারিজাত পাইয়া লজ্জার ঘাত
লুকায়া রহিল দেবস্থানে ॥
নীলকান্তি শ্বেত ছিল ভাবিয়া কজ্জল হৈল
শতদলে ছিল শত রঙ্গ।
সর্ব্বরঙ্গ গেল তার এক রঙ্গ হৈল সার
সে ভাবিছে কুমুদিনী সঙ্গ॥"[৪৩]

অথবা—

(খ) একটি কালো মেয়ের রূপ বর্ণনা (জবানে মুসলমানী) ঃ
কালোরূপ বটে বিবি শুনহে কালোর খুবি
আমি কিছু প্রচারিয়া কই।
কালো ছিল এ সংসার কালো মধ্যে ডিম্বাকার
ডিম্ব মাঝে গোপ্তে ছিল ওই॥
কালো রঙ্গে লা মাকান যেখানে নিলৈক্ষ্য স্থান
প্রকাশ করিছে জ্যোতির্ম্ময়।
ঘোর নিশি কাল রঙ্গ দরশন সথা সঙ্গ
মেহেরাজে দিল দয়াময়॥
কাল কদরের বাতি যে নিশি নূরানি জ্যোতি
হইয়াছিল প্রভাতে উদয়!
যে নারী সৌন্দর্য বেশ মাথে তার কালো কেশ
কালো বিনে শোভা নাহি পায়॥
কালগুণ বলা ভার কালরূপ কোকিলার
যার রবে জাগে প্রেমানল।
লাইলী যে কাল রঙ্গ মজিয়া যাহার সঙ্গ
মজনু যে হৈয়াছে পাগল॥"

৪৩। জামালউদ্দিন। প্রেমরত্ন কাব্য। ১২৭৪ সাল (=১৮৬৭ খ্রী)। রচনা— ১২৬০ (=১৮৫৩)। পৃঃ ৪৪।

(গ) তুলনীয়

কালোরূপ বটে ধনি কালোরে ভালই গণি
কালোরূপে আলো জ্যোতিম্ময়।
কালো রূপে বনমালী শ্রীমতিরে কুলে কালি
মজাইলে ব্রজে গোপীচয়ে।।

এ-ভাষাকে কি আধুনিক বাংলা ভাষা বলা যায় না? আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাষা থেকে এ ভাষা কি বহু দূরের?

সতেরো-আঠারো শতকের কাব্যগুরু শাহ গরীবুল্লাহ যে অভিনব বাংলা কাব্যরীতির জন্ম দিয়েছিলেন, প্রেমরত্নের ভাষায় তার সার্থক সাহিত্যিক রূপায়ণ ঘটেছে, এ-কথা বললে অন্যায় হয় না। বরং শাহ গরীবুল্লাহ ও নজরুল ইসলামের মাঝখানে সাহিত্যিক সংযোগ-সেতু হিসেবে জামালউদ্দীনের 'প্রেমরত্ন'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মরমী কবি লালন শাহের ভাষাও জামালউদ্দীনের ভাষার সমতালীয়। উদাহরণ আগেই দেওয়া হ'য়েছে। আরও একটু দেওয়া যাচ্ছে।

"পড়বে দায়েমী নামাজ
এদিন হ'ল আখেরী।
মাশুক রূপ হৃদ-কমলে
দেখ আশেক বাতি জেবলে
কিবা সকাল কি বৈকালে
দায়েমীর নাই অবধারী।
সালেকের বাহ্যপনা
মজ্জুবী আশেক দেওয়ানা,
আশেক দেল করে ফানা
মাশুক বই অন্যে জানে না,
আশার ঝুলি লয়ে সেনা
মাশুকের চরণ ভিখারী।।"

অথবা

'জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।
সত্য পথে মন নয় রাজী
সব দেখি তানা নানা" ইত্যাদি।

এ-কথা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয় যে, যখন ফোর্ট উইলিয়মের সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু ও ইংরেজ পন্ডিতগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আরবী-ফারসী তথা মুসলমানী ভাবধারা বর্জিত অভিনব আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সৃষ্টির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, প্রেমরত্নের কবি তখন পূর্বতন ধারার সংগে আধুনিক ধারার সংযোগে এই অভিনব কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সমকালীন হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিক ভাষাদ্বন্দ্বের স্পষ্ট জবাবও দিয়েছেন এ কাব্যে ; যথা—

"বাঙ্গালার সারি বাঙ্গালাতে ভালো আসে।
এ পর্যন্ত লেখা হৈল বাঙ্গালার ভাষে॥
লেখা যাবে এখন জবানে মোছলমানী।
সৃষ্টিমতে পদ তার না হবে মেলানি।

এখানে 'বাঙ্গালা' এবং 'জবানে মোছলমানী' বলতে যথাক্রমে সংস্কৃত প্রধান হিন্দুয়ানী বাংলা এবং আরবী-ফারসী প্রধান মুসলমানী বাংলা মনে করা হ'য়েছে। কবির মতে, জাতীয় আদর্শ হিসেবে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাদর্শও ভিন্ন হ'তে বাধ্য, তাকে জোর করে 'হিন্দুয়ানী' বা মুসলমানী' করা চলবে না। পক্ষান্তরে ফোর্ট উইলিয়মে এই প্রচেষ্টাই চলেছিল এবং সেখানে জোর করে মুসলমানী আদর্শ বর্জন করে বাংলা ভাষার নামে হিন্দুয়ানী আদর্শকেই চালু করা হ'চ্ছিল। এই প্রচেষ্টা যে নেহায়েৎ ভ্রান্ত সমকালীন কবি মালে মুহম্মদের, নিম্নলিখিত উক্তি থেকেও তার আভাস পাওয়া যায়,

"এই পুথির শায়ের ছিল আগু জামানার।
সমস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার॥

বুঝিতে পড়িতে লোকের বহুৎ কঠোলা।
তে কারণে অধিন রচে ছলিছ বাঙ্গালা ॥"[৪৩]

'ছলিছ', অর্থটি বা বিশুদ্ধ (ফাঃ سلیس)। বাংলাতে শব্দটি 'চলিত' শব্দের সমতালীয়। মালে মুহম্মদ সতেরো শতকের বিখ্যাত কবি আলাওলের "সয়ফল মুল্লুক বদীউজ্জামাল" শীর্ষক সমকালীন বাংলায় রূপান্তরিত করার সময় এই কথা বলেন (১৮২৮)। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, সতেরো শতকে লিখিত সংস্কৃত প্রধান বাঙ্গালা ভাষা উনিশ শতকের মুসলিম-সমাজে অচল হ'য়ে যায়; ফলে সেই বাংলা ভাষায় লিখিত কাব্যকেও সমকালীন চলিত বাংলায় ভাষান্তরিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা ঠিক এমনি সময়ে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সংস্কৃতায়িত করার প্রচেষ্টায় মাতেন ! জামাল উদ্দীন, মালে মুহম্মদ প্রভৃতির যুগোচিত সাবধানবাণী কোনো কাজে আসেনি ! ফলে, মুসলিম লেখকগণকে স্বতন্ত্র পথ বেছে নিতে হ'য়েছে। তাই ব'লে তাঁরা সকলেই তথাকথিত দোভাষী পুঁথির 'আসক-থারাবী'র খোশ গল্পে মশগুল হ'য়েছিলেন, এবং আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অন্ধ হ'য়েছিলেন, এমন কথা মনে ক'রবার কারণ নেই ! তা যদি হ'তেন তবে আমরা 'প্রেমরত্নে'র মত কাব্য, লালন শাহী সঙ্গীত ও 'শাহ মখদুম জীবনী'র মত গদ্য রচনা পেতাম না।

বাংলা সাহিত্যে শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ও দোভাষী পুঁথির উত্তরাধিকার ঃ

শাহ গরীবুল্লাহ-হামযার ভাষাদর্শ প্রকৃত প্রতিভার স্পর্শে যে উন্নততর কাব্য-সাহিত্যের বাহন হ'তে পারে, আলোচ্য 'প্রেমরত্ন', এমনকি আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' তারই

৪৩। মালে মুহম্মদ। সহি সয়ফল মুলুক ও বদীউজ্জামাল পুথি। পৃঃ ১। ছলিছ (ফাঃ سلیس = চলিত) ; অর্থ—বিশুদ্ধ (elegant)। রচনা—১২৩৫ সাল = ১৮২৮।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভারতচন্দ্র পরবর্তী রাধাচরণ গোপের 'ইমামএনের কেচ্ছা'র কথাও এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, ভারতের 'যাবনী মিশাল' পুঁথিকারদের 'ছলিছ' বা 'চলিত বাংলা' ও জামালউদ্দীনের 'জবানে মুসলমানী' মূলতঃ একই ভাষাদর্শের নামান্তর মাত্র, একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব তাই যথার্থই বলেন, ১৭৫৭ সালে পলাশীতে বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটলে শাহ গরীবুল্লাহ প্রবর্তিত মুসলমানী বাংলাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা হ'ত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্রিটিশ আমলে অন্ধ জাতীয়তার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে যখন হিন্দু মনীষিগণ আত্ম-প্রবুদ্ধ এক নবীন বাঙালী হিন্দু জাতীয়তা ও বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদ গড়তে অগ্রসর হ'লেন, তখন তাঁরা এই স্বাভাবিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা করে-ছিলেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে স্বপ্নের প্রাসাদ রচনার মত বহু অপপ্রয়াসেও তাঁরা মেতে উঠেছিলেন। সমকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজের কার্যকলাপের কথা প্রসংগক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নতুন পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এই নবীন হিন্দু ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ এমন সব উদ্ভট কার্য শুরু করেছিলেন, যার ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ধারা সুসংগঠিত করতে বহু বিলম্ব ঘটেছিল, এমনকি বহু পন্ডশ্রমও করতে হ'য়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা আগেই বলা হ'য়েছে, এবার কবি মধুসূদনের প্রয়াসের কথা একটু বলা প্রয়োজন।

মধুসূদন ও বাংলা ভাষা ঃ

কবি মধুসূদন অভিনব ভাষা ও ছন্দে তার অপূর্ব 'মেঘনাদবধ' কাব্য (১৮৬১ ইং) রচনা করে অমর হ'য়েছেন; কিন্তু এই অত্যাদ্ভুত কাব্য রচনার জন্য তাঁর যে অসম্ভব আড়ম্বর ও অধ্যবসায় অবলম্বন করতে হ'য়েছে, সে কথাও এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি।

মধুসূদনের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও বলতে পারা যায়, তাঁর 'মেঘনাদবধ' অপূর্ব রসোত্তীর্ণ কাব্য হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক বাংলা ভাষা রীতি থেকে তার দূরতিক্রম্য ব্যবধানও অনস্বীকার্য। এ সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত সমালোচনার সংগে সকলে হয়ত একমত হবেন না, তবে মেঘনাদবধের ভাষা যে স্বাভাবিক বাংলা ভাষা নয়, অনুস্বর বিসর্গ বিযুক্ত সংস্কৃত ভাষা, এ-কথা যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচক স্বীকার করবেন। একটু নমুনা দেওয়া যাক—

"দম্ভোলি নিক্ষেপি
সহস্রাক্ষে যে হর্যাক্ষ বিমুখে সংগ্রামে
সে রক্ষেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র রাখে পদতলে
বিমোহিনী দিগম্বরী যথা দিগম্বরে।"

তুলনামূলকভাবে সমকালীন তথাকথিত দোভাষী পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল, সত্যের অনুরোধে এ-কথা বলতে হবে। বস্তুতঃ মুসলিম পুঁথিকারদের প্রচেষ্টাই ছিল ভাষাকে অধিকতর সরল ও গণমুখী সাহিত্যের বাহন করবার অভিমুখে। ফলে জনকল্যাণের দিকটা বড় হওয়ায় কবিত্বের দিকটা ক্ষুণ্ণ হওয়া আশ্চর্য নয়। তাই বলে তা নিতান্তই সাহিত্যগুণ বর্জিত হয়েছিল, এমন কথা নিশ্চয়ই মনে করা যায় না। অবশ্য 'মেঘনাদবধ' উন্নততর প্রতিভার ফসল, তাই ফোর্ট উইলিয়মীয় 'গ্রাম্য পান্ডিত্য ও বর্বরতার' প্রশ্ন এখানে আসে না, তবে কথা হ'চ্ছে তার ভাষার কৃত্রিমতা নিয়ে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যে এই কৃত্রিমতার ঢেউ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। এই কৃত্রিমতার হাত থেকে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করে তাকে আবার স্বাভাবিক বাংলা ধারাতে পরিচালিত করতে কম বেগ পেতে হয়নি। আজও তার জের চলছে।

আধুনিক বাঙালী মুসলমান ও বাংলা ভাষা ঃ

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্ররোচনায় ইংরিজির পুষ্টি হবে বা ইংরিজিয়ানার জয় হবে, এটি স্বাভাবিক :

কিন্তু সমকালীন বাঙালী (হিন্দু) সমাজের উৎকট ইংরেজ প্রীতি ও মুসলিম বিদ্বেষ যে কি পর্যায়ে পেঁৗছেছিল সমকালীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার নিম্নলিখিত বিবৃতিটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—

"(রাজ ভাষা হিসেবে ফারসীর বদলে ইংরেজির প্রবর্তন হ'লে) first and foremost the hautiness of the Javans—will be brought low, which will be of much service to us. When the Bengali language is brought to use the Mussalmans will be driven out, for they are not and never will be able to read and write Bengali."[৪৪]

অর্থাৎ—

"(রাজভাষা হিসেবে ফারসীর বদলে ইংরিজি চালু হ'লে) প্রথম এবং প্রধান ফল এই হবে যে, যবনদের (মুসলমানদের) ঔদ্ধত্য খর্ব হবে, যা আমাদের বিশেষ উপকারে আসবে। যখন বাংলা ভাষা চালু হবে, মুসলমানেরা বিতাড়িত হবে, কেননা তারা বাংলা ভাষা লিখতে বা পড়তে পারবে না।"

এই ঘটনার অত্যল্পকালের মধ্যেই লর্ড মেকলে পরিকল্পিত শিক্ষা নীতি ঘোষিত হয় (ফেব্রুয়ারী ২, ১৮৩৫) এবং তা অবিলম্বেই কার্যকরী করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ক'লকাতা মাদ্রাসা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং কমিটি কর্তৃক আরবী-ফারসী পুস্তকাদির মুদ্রণ কার্যও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলিম-সমাজে বিরাট বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হ'য়ে ওঠে।[৪৫]

৪৪। Abdur Razzaq, The Mind of Educated Middle class in the nineteenth century Bengal, New values, Vol IX. No. 2 Dacca. 1957, P. 30.

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে" উদ্ধৃত পৃঃ ৪০। ১৯৬৫।

৪৫। মুস্তফা নূরুল ইসলাম। পরিক্রম (জগদুদ্দীপক ভাস্কর প্রবন্ধ)। শ্রাবণ, ১৩৭১। পৃঃ ৪৮৩—৪৮৮।

শুধু তাই নয়, অষ্টসহস্রাধিক মুসলিম জন-স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্রে গভর্নর জেনারেলকে মাদ্রাসা চালু রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়। পক্ষান্তরে সরকারী পরিকল্পনাকে অভিনন্দিত করে ছয় সহস্রাধিক হিন্দু-জন-স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে ফারসী ভাষাকে রাজভাষা থেকে অপসারিত করে তদস্থলে ইংরাজী ভাষা অবিলম্বে চালু করার জন্য দাবী জানানো হয়। পূর্বোক্ত 'সমাচার দর্পণে' এই হিন্দু মনোভাবের প্রতিফলন দেখে তাই বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

তবে সমকালীন মুসলিম-মানসের পরিচিতিমূলক কোন মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্র ইত্যাদির সন্ধান না পাওয়ায় এ-বিষয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পেঁছা সম্ভব নয়; তবে মুসলিম সমাজ যে এ-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল না, বরং সচেতনভাবে এই সব মনোভাবের মুকাবিলা করতে সচেষ্ট ছিল, সমকালীন হিন্দু পরিচালিত পত্র-পত্রিকাদিতেও তার স্বাক্ষর দুর্লক্ষ্য নয়।

অবিশ্যি সমকালীন মুসলিম-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত সংবাদ পত্রাদির সন্ধান এক-আধখানি মিললেও তার কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণী পাওয়া যায় না,[৪৬] তাই একদেশদর্শী হিন্দু সংবাদপত্রসেবীদের বিবৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই! কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এইসব পত্র-পত্রিকার মুসলিম-বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সমকালীন মুসলিম-মানসের একটি সুষ্ঠু ধারণা করতেও বিশেষ কষ্ট হয় না।

তাই আজ এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সাধনায়ও বাঙালী হিন্দুর চেয়ে বাঙালী মুসলমান বিশেষ পিছিয়ে ছিল না; অন্ততঃ ফোর্ট উইলিয়ম যুগের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে তারাও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ ক'রেছিল,

---

৪৬। সম্প্রতি 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১) ও 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (১৮৪৬) নামে দু'খানি মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এদের সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আলিমুল্লা ও রজব আলী। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।

'শাহ মখদুম জীবনী' 'লালন শাহের গান', 'প্রেমরত্ন' কাব্য ইত্যাদির ভাষাদর্শে তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এবং বলা হ'য়েছে যে, মখদুম জীবনী রচনাকালেও 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে পরিচিত বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব হয়নি, আর 'প্রেমরত্ন' রচনা কালেও মধুসূদন বিহারীলালের আগমন হয়নি। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর-মধুসূদন পূর্বকালে বাংলা গদ্য-পদ্যের যে রূপ ছিল, তা আদৌ সাহিত্য পদবাচ্য ছিল না এবং কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও বর্বরতার' ঊর্ধ্বে উঠে 'বিশ্বের ভদ্রসভায় আসন গ্রহণের'ও উপযোগী ছিল না। অথচ পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহের ভাষাই ছিল যথার্থ ভদ্রসভার উপযোগী। তাই এ গুলি শুধু বাংলা মুসলিম সাহিত্য সাধনার ইতিহাসেই নয়—সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরই বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ।

আধুনিক বাঙালী হিন্দু ও বাংলা ভাষা ঃ

মুসলিম সমাজ কেন, হিন্দু-সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশও যে সহজভাবে ফোর্ট উইলিয়মীয় সাধু বা খাঁটি বাংলা রীতির অনুমোদন করেনি, 'ফুলমনি ও করুণা,' 'সুশীলা উপাখ্যান' ইত্যাদির ভাষাই তার প্রমাণ। 'আলালের ঘরের দুলালের' তো কথাই নেই। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু মনীষীরাও এই তথাকথিত শুদ্ধিকরণের বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ জানিয়েছেন—"Can anything be more absured to think of keeping language pure, when blood itself can not be pure? No human language has ever been perfectly pure, any more than any human race has been pure. Infusion of foreign elements do in the long run enrich languages just as infushion of foreign blood improves races." মানে, মানুষের রক্তই যখন অবিমিশ্র নয় তখন ভাষাকে অবিমিশ্র রাখার কল্পনা কি অবান্তর নয়? কোনো মানব-জাতি কখনও অবিমিশ্র বা সম্পূর্ণ খাঁটি থাকতে পারেনি, ভাষা

তো দূরের কথা! বৈদেশিক রক্তের মিশ্রণে যেমন মানবজাতি অধিকতর উন্নত হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

শুধু কি তাই, সাধুভাষার দল ভাবতেন, "With Sanscrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere is therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery. In the long run, however considerations of utility are sure to override mere sentimental predilections."

মানে, সংস্কৃতের সঙ্গে ভারতের গৌরবময় প্রাচীন দিনগুলির স্মৃতি-বিজড়িত, পক্ষান্তরে, ফারসী ও আরবীর সঙ্গে তাদের পরাজয়, অবমাননা ও পরাধীনতার সংস্পর্শ বিদ্যমান। উদ্ভিন্নমান হিন্দু জাতীয়তা তাই স্বাভাবিকভাবেই আরবী ও ফারসী শব্দ-সম্পদকে পরাধীনতার স্মারক মনে করে। অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এই নিছক ভাবালুতার অবসান ঘটবে।

উল্লেখ্য যে, এমনি যুগ-সন্ধিক্ষণেই এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি এসে এই ভাষা-সমস্যার একটা সহজ-সমাধানের প্রয়াস পেলেন বটে, তবে তাতে করে বিষয়টির স্থায়ী সমাধান হল না, আপাততঃ ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ল মাত্র। এ-বিষয়ে মন্তব্য করবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মনোভাব জানা প্রয়োজন। তাঁর নিজেরই ভাষায়—"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারা শংকরের 'কাদম্বরীর অনুবাদ' আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশের দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের স্রষ্টা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। আর তাঁহার দ্বিতীয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান

আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরেজ বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না।"[৪৭] এখানে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বৎসরে পূর্বে কথিত অজ্ঞাতনামা শাহ মখদুম জীবনী রচয়িতাই বঙ্কিমচন্দ্র কথিত "আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে" পেঁৗছতে সক্ষম হয়েছিলেন; এবং তার অব্যবহিত পরে রচিত ও প্রকাশিত জামাল উদ্দীনের 'প্রেমরত্ন' কাব্যের ভাষাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্যের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমকালীন আত্মগর্বী অন্ধ পন্ডিত সমাজ তাঁদের সে কীর্তির পানে ফিরেও তাকাননি, ফলে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে কালে কালে তা বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছিল; এভাবে বাংলা সাহিত্যের ভাষাও একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, যার হাত থেকে উদ্ধার করে আজ আবার তার স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করাও কঠিন হয়ে উঠেছে[৪৮]। মনে হচ্ছে যেন—

"সে ভাষা ভুলিয়া গেছি। নাম দোহাকার
উভয়ে খুঁজিনু কত মনে নাহি আর।"

৪৭। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড (প্যারীচাদ মিত্র প্রসঙ্গ)।
৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত।

পরিশিষ্ট

হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ : একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত

মিঃ ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) রচিত বাংলা ব্যাকরণ (A Grammer of the Bengal Language, 1778) বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ নয়, এমনকি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থও নয়। এর বেশ কিছুকাল আগেই ফরাসী পণ্ডিত ম্যানুয়েল দ্য আশসুম্প সাঁও কর্তৃক পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান (Vocabulario em idioma Bengalla e portugues) রচিত ও মুদ্রিত হয় (১৭৪৩) তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ" ও (Crepar Xaxtrer Orth, Bhedo) ১৭৩৩ সালে রচিত ও ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়। উভয় গ্রন্থেই বাংলা হরফের বদলে রোমান হরফ ব্যবহৃত হয়। সমকালে রোমান হরফে আরও একখানি বাংলা বই রচিত হয়েছিল, নাম—ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' * লেখক 'দোম আন্তোনিও' নামধারী জনৈক বাংলাদেশীয় রাজকুমার। কথিত আছে, ইনি ছেলেবেলায় বাংলাদেশর ভুষণা রাজ্য (ফরিদপুর) থেকে পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়ে পরে পর্তুগীজ পাদ্রী কর্তৃক উদ্ধৃত হন ও খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর আসল নাম অজ্ঞাত। তবে মিশনারী মহলে তাঁর নতুন নামকরণ হয় দোম আন্তোনিও-দে-রোজারিও' বলে। তাঁর বইখানি মুদ্রিত হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া গেলেও তার কোন মুদ্রিত কপি অদ্যাবধি উদ্ধৃত হয়নি। বলাবাহুল্য, বইখানিতে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম ও হিন্দু ধর্মের হীনত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* বইখানির একটি লম্বা পর্তুগীজ নাম আছে। বাংলা ভাষায় তার অর্থ—'জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার'।

যতদূর জানা যায়, খৃষ্টান পাদ্রীদের কল্যাণে একখানি ফরাসী গ্রন্থে ১৬৯২ সালের দিকে সর্বপ্রথম বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়। এরপর ১৭৫২ সালে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ও লাইপজিগে মুদ্রিত "জর্জ জেকব কের" (George Jecob Kehr)-এর "Aurenck Szeb" (আওরংক জেব) গ্রন্থেও বাংলা হরফ ব্যবহারের কথা জানা যায়। শুধু তাই নয়, এ বই-এ ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং "Sergant Wolfgang Meyer" এই জার্মান নামটি পর্যন্ত বাংলায় অক্ষরান্তরিত করে "শ্রী সরজন্তু বলপকাং মা-এর" রূপে মুদ্রিত হয়েছে।[১]

মোট কথা, হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণের বহু পূর্বে থেকেই বাংলাদেশের বাইরে বাংলা ভাষা ও লিপি মুদ্রণের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। তবে হ্যালহেড সাহেবের গ্রন্থ মুদ্রণের আগে বাংলা হরফ এত সুন্দর ও সার্থকভাবে মুদ্রিত হতে পারেনি। এই হিসেবে আলোচ্য ব্যাকরণ খানির মুদ্রণ বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অবশ্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে রচিত হলেও বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার সংগে তার সম্পর্ক নাম মাত্র।

সংক্ষিপ্ত আটটি অধ্যায়ে তিনি এই ব্যাকরণে বাংলা ভাষার অক্ষর ও বানান থেকে শুরু করে ছন্দ প্রকরণ পর্যন্ত ব্যাকরণের যাবতীয় বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন বটে, তবে বইখানি ইংরাজিতে এবং ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য রচিত বলে বাংলাদেশীয় পাঠকদের প্রতি তিনি বিশেষ সুবিচার করতে পারেননি। তবে বাংলা পুথি-পত্র থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। হ্যালহেড সাহেবের আর একটি কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলাদেশের মাটিতেই সর্বপ্রথম বাংলা হরফ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং বাংলাদেশেই বাংলা হরফে গ্রন্থ মুদ্রণের সূত্রপাত করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সার্বিকভাবে সহায়তা

১। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪ (১৩৭১ সাল) পৃঃ ২৪।

দান করেন তাঁরই মত একজন য়ুরোপীয় মনীষী 'বাংলায় ব্যাক্সটন' নামে খ্যাত চার্লস উইলকিন্স। চার্লস উইলকিন্স সর্বপ্রথম মুদ্রণযোগ্য বাংলা হরফের নির্মাতা। অবশ্য বাংলা হরফের সর্বপ্রথম সাঁট নির্মাতা কে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বাংলা 'বিশ্বকোষ' রচয়িতার মতে, উইলকিন্স নন—তাঁর সহকারী পঞ্চানন কর্মকারই বাংলা হরফের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ সাঁট (complete fount) নির্মাতা। পঞ্চানন কর্মকার হুগলী জিলার বাসিন্দা। সত্যি কথা এই যে, পঞ্চানন উইলকিন্সেরই শিষ্য ছিলেন। তিনি ও তাঁর গুরু উইলকিন্স দুজনে মিলেই বাংলা হরফের সম্পূর্ণ সাঁট নির্মাণে সফলতা লাভ করেন। এ ব্যাপারে আবিষ্কারের মর্যাদা দিতে গেলে পঞ্চানন নয়, উইলকিন্সকেই দিতে হয়। তবে পঞ্চানন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরবর্তী বাংলা হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণের ইতিহাসে পঞ্চানন ও তাঁর পুত্র মতান্তর জামাতা মনোহর, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ইতিহাসে হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশ যে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ বই প্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় পুস্তক মুদ্রণের হিড়িক পড়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যে বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও তার মুদ্রণ বিভাগের কল্যাণে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি হয় (১৮০০ খৃঃ)।

হ্যালহেড সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী, ব্যাকরণ রচনাকালে প্রাচীন ও সমকালীন বাংলা বই-এর মাত্র ছয় খানি কলমী পুঁথি তাঁর সম্বল ছিল। তার লেখক ছিলেন যথাক্রমে কৃত্তিবাস (পনেরো শতক), কাশীদাস (সতেরো শতক) ও ভারত চন্দ্র (আঠারো শতক)। এঁদের মধ্যে একমাত্র ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর ছিলেন হ্যালহেড সাহেবের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক। হ্যালহেড সাহেব ভারত চন্দ্রকে দেখেছেন কি না, জানা যায় না, তবে তিনি ভারত চন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" (১৭৫২) কাব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। আর সমকালীন

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা লিখেছেন তার সংগে ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল "বাংলা ভাষার মিল আছে। যেমন তিনি লিখেছেন—" At present those persons are thought to speak the compound idiom (Bengali) with the most elegance who mix up with the pure Indian verbs, the greatest number of persian and Arabic nouns"[২] মানে, বর্তমানে সেই লোককেই অধিকতর শুদ্ধভাষী বলা হয়, যার কথায় অধিকতর আরবী পারসী শব্দের আমেজ দেওয়া হয়ে থাকে।

তুলনীয় ভারতচন্দ্রের উক্তি ঃ

"মানসিংহ পতশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী ॥
বুঝিয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥

বাংলা সাহিত্যে এই 'যাবনী-মিশাল' ভাষার স্রষ্টা ভারতচন্দ্র নন তার পূর্বসূরী শাহ গরীবুল্লাহ। দুর্ভাগ্যক্রমে শাহ গরীবুল্লাহ আজ তথাকথিত দোভাষী বা মুসলমানী বা 'হেয় ভাষা বাংলা'র স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত। গরীবুল্লাহ্‌র আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, গরীবুল্লাহ্‌র 'সোনাভান' রচনাকালে (১১২৭ সাল—১৭২০ ঈ) ভারত চন্দ্র সবেমাত্র সাত বৎসরের বালক ছিলেন। তাঁর জীবন কাল—১৭১২—১৭৬০ ঈ। রবীন্দ্র চোপরা সাম্প্রতিককালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'Islamic Review' পত্রিকায় (১৯৬০) স্পষ্টভাবে ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গীয় কতিপয়

২ The Bengali Prose Style, Dr. Dinesh Chandra Sen. See P 6.

হিন্দু কবিকে গরীবুল্লাহ্ প্রভাবিত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই ভারতচন্দ্রের উক্তি সত্য হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে শাহান-শাহের মর্যাদা অবশ্যই দিতে হয়। ভারতচন্দ্র অবশ্য গরীবুল্লাহ্‌র নাম করেননি, তবে শিষ্য সৈয়দ হামজা স্পষ্টই বলেছেন ঃ

'আল্লার মকবুল শাহ গরীবুল্লাহ নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।।
আছিল রওশন দেল সায়েরী জবান।
যাহারে মদদ গাজী শাহা বড়েখান।।
শায়েরী করিলেন পুঁথি আমির হামজার।
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কিচ্ছার।
তামাম কিতাব যদি পাইতেন দেওয়ান।
গাঁথিত কবিতা হার মুক্তার সমান।।

উনিশ শতকের কবি মোহাম্মদ মুনশীও বলেছেন ঃ

"সৈয়দ হামজা আর শাহ গরিবুল্লা।
এ দোন শায়ের ছিল আলম উজ্জালা।
যতদুর গেছে তার কবিতার হার।
পড়িয়া শুনিয়া সবে হয় চমৎকার।।
এ দোন ওস্তাদ পরে আদাব সালাম।
দুনিয়াতে রেখে গেছে কি শিরি কালাম।।
রচনার ওজন মিল কিবা চমৎকার।
গাঁথিল কবিতা হার আমির হামজার।।
না হবে না হইয়াছে তেয়ছাই রচনা।
যে যাহা করিল তার না হবে তুলনা।

—(উম্মর উম্মিয়ার নকল কাব্য)।

কৌতুহলের ব্যাপার সমকালীন আর একজন কবি (আবদার রহীম) 'তাঁকে হেয় ভাষা বাঙ্গালার' গ্রন্থকার বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর প্রশংসাও করেছেন।

"হেয় ভাষা বাঙ্গালার আছে কত গ্রন্থকার
তাদেরও শ্রেষ্ঠ বলে মানি।
যেমন এরাদতুল্যা আর নামি গরিবুল্লা
হস্ত করে তাদেরে বাখানি॥
—(প্রেমলীলা. ১২৭৫ সাল=১৮৬৮)।

আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের একটি উক্তি এই প্রসংগে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি। "যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"[৩]

হত কি হত না, এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিবর্তনের যে সুস্পষ্ট ধারা পরিলক্ষিত হয়, তাতে ডক্টর সাহেবের এ-উক্তির সত্যতা স্বীকৃত হয়। ঐতিহাসিক সজনীকান্তের উক্তি এর অনুকূলে।

মনীষী হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, সমকালীন সুধী-সমাজে আরবী ফারসীর আমেজ দেওয়া বাংলা ভাষাই বিশুদ্ধ ভাষা বলে গৃহীত হয়েছিল। গরীবুল্লাহ—সৈয়দ হামজার কবি ভাষা তারই আদলে সংগঠিত। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও তার সমর্থনে মন্তব্য রাখলেন; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, অল্প দিনের মধ্যেই এই ভাষা 'হেয় ভাষা' বা 'অসাধু ভাষা' নামে অভিহিত হ'ল। তার কারণও যে অস্পষ্ট, এমন নয়। হ্যালহেড সাহেব ব্যাকরণ রচনাকালে যে ভাষারীতি লক্ষ্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি তাকে পরিবর্তন-যোগ্য মনে করেছিলেন এবং সে কাজে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরাও বিশেষ সচেতন হয়েছিলেন। মার্শম্যান, কেরী প্রমুখ মনীষিগণ প্রত্যক্ষে হোক, আর পরোক্ষে হোক, তাঁর আনুকূল্য করেছিলেন। সজনীকান্ত দাসের ভাষায় বলা যায়"—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের

৩। আমাদের সমস্যা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা, ১৯৪৯। পৃঃ ৭।

সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে।"

বলা বাহুল্য, ১৭৭৮ সালেই হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই যজ্ঞের ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সজনীকান্তের ভাষাতেই বলি—"সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন, ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল"।[৪] এর সহজ অর্থ এই যে, বাংলা ভাষাই সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল এবং এ ব্যাপারে সাহেব পন্ডিতেরাই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), হেনরী ফরস্টার ও যোশুয়া ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭)। শেষোক্ত মার্শম্যান পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা" গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন (১৮৩৩)। যাতে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের খাঁটি বা সাধু বাংলার প্রশংসা (Purest Bengali) করেন। তাঁর মতে, মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের অন্যতম (One of the most profound scholars of the age) এবং তাঁর বইখানি বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত (Written in purest Bengali)[৫] কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, এ-বই-এর ভাষা রীতির প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, লেখক সুকৌশলে 'বিদেশোদ্ভূত' শব্দ সম্পদ বর্জন করেছেন, (All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded) যার ফলে, মার্শম্যান মনে করেছেন, বইখানির মূল্য বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।

৪। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। সজনীকান্ত দাস। সংস্কৃতিকরণ অধ্যায় পৃঃ ৩২-৩৩।

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা। ভূমিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৮০৩।

উল্লেখ্য যে, বিদেশোদ্ভুত বলতে এখানে আরবী-পারসী শব্দ সম্পদ মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত, সেই সংগে ইংরেজী-ফরাসী-পর্তুগীজ ইত্যাদি শব্দ সম্ভারকে বিদেশীয় বলে গ্রহণে আপত্তি করা হয়নি। শুধু তাই নয়, এই কার্য-সিদ্ধির জন্য কয়েকখানি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মার্শম্যান সাহেবের Purest বা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাই 'সাধু' এবং পূর্বতন রীতি 'অসাধু' বা দোভাষী, মুসলমানী, চলিত ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। ফল যা হবার, হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম পর যুগে (১৮০০) এসে দেখা গেছে, বাংলা ভাষা এক রকম বাংলাত্বই বর্জন করে খাঁটি আর্য ভাষায় (সংস্কৃত) রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক নামে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা এত খাঁটি হয়েছিল যে, তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭) ও "সীতার বনবাস" (১৮৬০) গ্রন্থদ্বয়ের শব্দ-সম্ভারের শতকরা ৯০ থেকে ৯৯ ভাগ পর্যন্ত সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে অবহেলিত হলেও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধারাও পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। মূল গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাদীস শরীফে একটি কথা আছে, কাজ নির্ভর করে কর্মীর নিয়ত বা মননের পরে। হ্যালহেড সাহেবদের মননের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা শুধু সিভিলিয়ান সাহেবদের শেখাবার উদ্দেশ্যেই বই লেখেননি, নেটিভ বাঙালীদের বাংলাকেও তাদের উপযোগী করে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল তাঁদের। কারণ তাঁরা চাইতেন, নেটিভরাও তাঁদের মত ভাবনা-চিন্তা করুক, অন্ততঃ তাঁদের অনুকূলে একটি শ্রেণী গড়ে উঠুক, যাঁরা তাঁদেরই আনুকূল্য করবে। লর্ড মেকলের সেই বিখ্যাত উক্তিটির কথাও এই প্রসংগে স্মরণ করা যায় যথা,—

"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

হ্যালহেড সাহেব ছিলেন এ'দেরই পূর্বসূরী. বলা যেতে পারে মুরব্বীও। ইতিহাস পাঠকদের অজানা থাকবার কথা নয়. এ ব্যাপারে তাঁরা বাংগালী হিন্দু সমাজের, বিশেষ করে সংস্কৃত নবিসদের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে যে বাংলা গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সংস্কৃত নবিসরাই ছিলেন তার প্রধান রূপকার। বাঙ্গালী মুসলমানদের তরফ থেকে এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিশেষ আমলে আনা হয়নি। এর ফল যে ভালো হয়নি. সমকালীন পন্ডিত সমাজ লক্ষ্য না করলেও, পরবর্তী এবং নিরপেক্ষ হিন্দু মনীষিগণও তা লক্ষ্য করেছেন। সুধী সমাজের অবগতির জন্য পণ্ডিত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

তিনি স্পষ্টই বলেছেন ঃ

"Can anything be more absured to think of keeping language pure, when blood itself can not be pure? No human language has ever been perfectly pure, any more than any human race has been pure. Infushion of foreign elements do in the long run enrich languages just as infushion of foreign blood improves races"[৬] মানে. মানুষের রক্তই যখন অবিমিশ্র নয় তখন ভাষাকে অবিমিশ্র রাখার কল্পনা কি অবান্তর নয়? কোনো মানব জাতি কখনই অবিমিশ্র বা সম্পূর্ণ খাঁটি থাকতে পারেনি, ভাষা তো দূরের কথা। বৈদেশিক রক্তের মিশ্রণে যেমন মানব জাতি অধিকতর উন্নত হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়।

শ্যামাচরণ বাবু লক্ষ্য করেছেন, সাধু ভাষার দল ভাবতেন, সংস্কৃতের সংগে ভারতের গৌরবময় প্রাচীন দিনগুলির স্মৃতি বিজড়িত, পক্ষান্তরে ফারসী ও আরবীর সংগে তাদের পরাজয়, অবমাননা ও পরাধীনতার সংস্পর্শ রয়েছে। উদ্ভিন্নমান হিন্দু জাতীয়তা তাই স্বাভাবিকভাবেই

৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী। বসুমতি, কলিকাতা। (বঙ্গ দর্শন, ১২৮৭ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত) পৃঃ ২৩৫।

আরবী ও ফারসী শব্দ সম্ভারকে পরাধীনতার স্মারক মনে করে তা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন।

তিনি আশাও করেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ভাবালুতার অবসান ঘটবে। অবশ্য হ্যালহেড সাহেবদের শিক্ষা ছিল সমকালীন হিন্দু মানসেরই অনুকূলে। তা না হলে সমকালীন সমাচার দর্পণে এ কথা কিছুতেই লেখা সম্ভব হ'ত না—"(রাজভাষা হিসেবে ফারসীর বদলে ইংরাজী চালু হলে) প্রথম এবং প্রথম ফল এরূপ হবে যে, যবনদের (মুসলমানদের) গৌরব খর্ব হবে, যা আমাদের বিশেষ উপকারে আসবে। যখন বাংলা ভাষা চালু হবে, মুসলমানেরা বিতাড়িত হবে, কেননা তারা বাংলা ভাষা লিখতে বা পড়তে পারে না, এবং কখনও তারা তা লিখতে বা পড়তে পারবে না।"[৭] উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ঘোষিত হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫) এবং অবিলম্বেই তা কার্যকরী হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে কলকাতা মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কমিটি কর্তৃক আরবী-ফারসী পুস্তকাদির মুদ্রণ কার্যও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে হ্যালহেড সাহেবের অভিলাষও পূর্ণ হয়, সত্যের অনুরোধে এ কথা বলতে হবে। তবে বাংলা মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হওয়ায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়, আজও তার ধারা অব্যাহত। হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশই তার অন্যতম কারণ। এদিক দিয়েও আমাদের লাভ কম নয়।[৮]

৭। The Mind of Educated Middle Class in the Nineteenth Century Bengal.
New values, Vol. IX. No, 2, Dacca, – 1957, P, 30

৮। (ক) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য – মৎ লিখিত "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা পরিক্রমা"। সাহিত্যিকী। রাজশাহী, ১৩৭৪ [বসন্ত সংখ্যা] – ১৯৬৭।

[খ] প্রবন্ধটি 'উজ্জ্বল বগুড়া প্রদর্শনী—৭৮'এর উদ্যোগে আয়োজিত মুদ্রণ ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বগুড়া মহা সম্মেলনে [২২, ২৩, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭৯] লেখক কর্তৃক পঠিত ও বগুড়া সাহিত্য মহা সম্মেলন স্মরণিকায় প্রকাশিত। বগুড়া, ১৯৭৯।
মোস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত।

প্রমাণ-পঞ্জী

আবুতালিব, মুহম্মদ। মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা। রাজশাহী, ১৯৬৬।

" লালন শাহ ও লালন-গীতিকা, ১-২। ঢাকা, ১৯৬৮।

" বিস্তৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়। ঢাকা, ১৯৬৮।

" (সম্পাদিত) হজরত শাহ মখদুম। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৪=১৯৬৭।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার। কলি, ১৩৬৪=১৯৫৭।

" গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর।

জামালউদ্দীন। প্রেমরত্ন। কলি, ১২৭৪=১৮৬৭। ২য় সং।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাহিত্যিক।

নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ আবু সুফিয়ান। বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস (১ম সং)।

পুলিন বিহারী সেন (সম্পাদিত)। রবীন্দ্রায়ণ ১ম খন্ড। কলি, ১৩৬৮=১৯৬১।

প্রবোধচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) রবীন্দ্রনাথের ছন্দ।

বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। কলি, ১৩৬৬=১৯৫৯।

মনিরুজ্জামান। আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ঢাকা, ১৯৬৫।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। প্রবোধ চন্দ্রিকা। কলি, ১৮৩৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চারিত্র পূজা।

সজনীকান্ত দাস। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। বা-এ, ঢাকা, ১৩৭১=১৯৬৪।

সুকুমার সেন, ডক্টর। বাংলা সাহিত্যে গদ্য। কলি, ১৩৫৬(=১৯৪৯)।

" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড।

সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ২য় খন্ড। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রসঙ্গ।

পত্র-পত্রিকা

পরিক্রম। ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১(=১৯৬৪)।

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৫৯। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

বর্ণালী (পত্রিকা) ঢাকা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৬৭।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা ঃ সাধুতা বনাম অসাধুতা

নাম সূচী

(গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও স্থান)

অ

অজ্ঞাতনামা জীবনী লেখক (শাহ মখদুম জীবনী)—৭,৩৯
অক্ষয় কুমার দত্ত ১৯

আ

আওরঙ্গজীব ১৫
আবদার রহিম ৪৬
আবদুল কাদির জিলানী ১৫
আলালের ঘরের দুলাল ২৫, ৩৯
আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ১৫ (ডেপুটি কালেক্টর)
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর ২৬

এ

এব্রাহিম হোসেন ১৫

উ

উমর উম্মিয়ার নকল ৪৬

ক

কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ৩০
কুলীন কুল সর্বস্ব ৩০
কেরী, উইলিয়ম ৩,১৩
কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ ৪২
ডোম আন্তোনিও ৪২

গ

গরীবুল্লাহ, শাহ— ৩২,৩৪,৩৫, ৪৫,৪৭
গৌড় ভাষার ব্যাকরণ ৭

চ

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭
চার্লস উইলকিন্স ৪৪
চৈতন্য চরিতামৃত ৪

জ

জগদ্‌দন্দীপক ভাস্কর ৩৮
জামাল উদ্দীন ২২, ২৯, ৩৪

ড

ডোম আন্তোনিও ৪২

ত

তুরকান শাহ ১৫
তোহফা ৪

দ

দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর ৩

ন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬, ৪০
নিউটন ৬

প

পদ্মাবতী ৪
পঞ্চানন কর্মকার ৪৪
পুলিন বিহারী সেন ২৮
প্যারীচাঁদ ২৫
প্রতাপাদিত্য চরিত্র ২, ১১
প্রবোধ চন্দ্রিকা ৪, ৮, ৯, ৪৮
প্রেমরত্ন ২৯, ৩৪, ৩৯, ৪১
প্রেমলীলা ৪৭

ফ

ফরস্টার ১৩
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ২৫, ২৭, ৩৯

ব

বঙ্কিমচন্দ্র ২৭, ৪০, ৪১
বাঘা ১৫
বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাস ২৬
বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস ১৩
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ৬, ১৯, ২৭
বিনয় ঘোষ ১৯
বেতাল পঞ্চবিংশতি ৭, ৯, ২১, ৪৯
বেদান্তগ্রন্থ ৪

ভ

ভারত চন্দ্র ৪৪, ৪৬

ম

মধুসূদন ২৪, ৩৫, ৩৬
মসিয়তুল্যা, সৈয়দ ১৫
মহাকাল গত ১৫
মালে মুহম্মদ ২২, ৩৪
মার্শম্যান ৩, ১৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯
ম্যানুয়েল দ্য আন সুম্পসাঁও ৪২
মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা ৭
মুহম্মদ খাতের ২২

মুহম্মদ সিদ্দিক খান   ৪৩
মেকলে, লর্ড   ১, ৩৭
মেঘনাদ বধ   ৩০
মোহাম্মদ মুনশী   ৪৬
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান   ৩৭
মোস্তফা নূরুল ইসলাম   ৩৭
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার   ৪, ৮, ১৫

র
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়   ২৯
রবীন্দ্রায়ণ   ২৮
রবীন্দ্র চোপরা   ৪৫
রবীন্দ্রনাথ   ২, ২২, ২৩, ৩৯
রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ'   ২৪
রামমোহন রায়   ৪, ৫, ৭
রামরাম বসু   ২, ৩, ১১

ল
লালন ২২, ২৩, ৩২, ৩৩, ৩৯

শ
শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ   ১৬, ১৭, ৪৭
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়   ৩৯, ৪০, ৪১, ৫০

স
সজনীকান্ত দাস   ১২, ১৪, ৪৮
সমাচার দর্পণ   ৩৭
সমাচার সভা, রাজেন্দ্র   ৩৮
সয়ফল মুল্লুক বদীউজ্জামাল   ৩৪
সীতার বনবাস   ১০, ২৫, ৪৯
সুকুমার সেন, ডক্টর   ১২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়   ৬
সুশীল কুমার দে   ১১
সুশীলা উপাখ্যান   ২৫, ২৭, ৩৯
সৈয়দ হামজা   ৪৬

হ
হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রঃ) এর জীবনেতিহাস   ৭, ১৪, ১৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী   ২, ১১
হান্না ক্যাথেরিন মুলেন্স   ২৫
হ্যালহেড ৩, ১২, ১৩, ৪২, ৫১